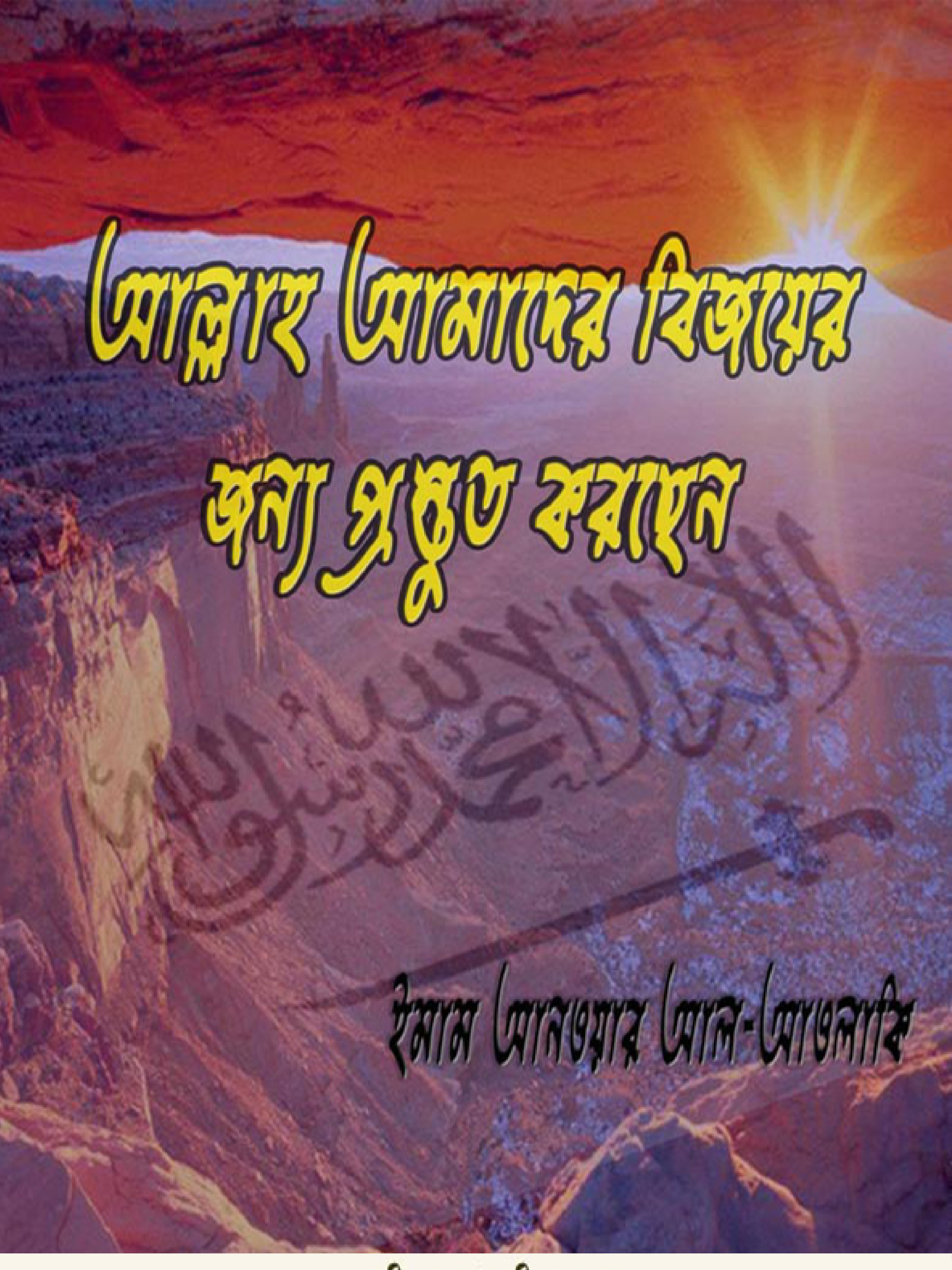


আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স


دار البيان

আল্লাহ্ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করছেন

ইমাম আনওয়ার আল-আওলাকি

(আল্লাহ্ তাঁকে নিজ হেফাজতে রাখুন)

আল্লাহ্ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করছেন

ইমাম আনওয়ার আল-আওলাকি (আল্লাহ্ তাঁকে নিজ হেফাজতে রাখুন)-এর অডিও লেকচার অবলম্বনে

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা *'মুসলিমীন ফী কুল্লি মাকান'* (সর্বস্থানের মুসলিমদের) প্রতি উৎসর্গিত, যারা অন্ধকারাচ্ছন্ন কুফরের বিরুদ্ধে সত্যের বিজয় সন্ধানে বদ্ধ পরিকর। হে মুওয়াহিদ! তোমরা আনন্দিত হও এজন্য যে, আল্লাহ্‌র বিজয় অতি নিকটে, কেবল যদি তোমরা তা দেখতে পেতে!

يريدونَ أنْ يطْفئُوا نور الله بِأفْواههم ويأبى الله إلا أنْ يتم نوره ولَو كَره الْكَافرونَ

"ওরা চায় ফুৎকার দিয়ে আল্লাহ্‌র আলো নিভিয়ে দিতে, কিন্তু আল্লাহ্ তা পূর্ণাঙ্গ করবেনই, কাফিরদের নিকট যতই তা ঘৃণা ও গাত্রদাহের কারণ হোক।"

[সূরা আত-তওবাহ্ ঃ ৩২]

সূচীপত্র

শাইখের পরিচয়



ইমাম আনওয়ার আল-আওলাকি একজন উচুঁমানের বিদগ্ধ মুসলিম আলেম যিনি নিউ মেক্সিকোতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাতা ইয়েমেনী। ইয়েমেনেই তাঁর জীবনের এগারো বছর কাল অতিক্রান্ত হয়। সেখানে তিনি ইসলামের উপর প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন।

আনওয়ার আল-আওলাকি কলোরাডো ক্যালিফোর্নিয়াতে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে অবস্থিত '*দার আল-হিজরাহ*' ইসলামিক সেন্টার এবং জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির মুসলিম প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। আমেরিকা এবং ইয়েমেন, এক দেশ থেকে অপর দেশে তিনি প্রায়ই যাতায়াত করতেন। সেখানে প্রসিদ্ধ আলেমগণের সান্নিধ্যে *শরীয়াহ্*-র উপর পড়াশোনা করতেন এবং আমেরিকার নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তিতে তাঁকে আমেরিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি.এস.সি. এবং সান ডিয়েগো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এডুকেশন লিডারশিপে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলেপমেন্টএর ওপর গবেষণারত ছিলেন।

তাঁর বহুল জনপ্রিয় অডিও সিরিজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - "Lives of the Prophets", "The Hereafter", "The Life of Muhammad (saws)", "The Life and Times of Abu Bakr Al-Siddique (ra)", "The Life and Times of 'Umar

Ibn Al-Khattab (ra)”, “The Story of Ibn Al-Akwa”, “Constants on the Path of Jihad”, এবং আরও অনেক।

কুফ্ফার এবং মুরতাদগণ তাঁকে ইয়েমেনের রাজধানী, সানায় আটক করে। এর কারণ পরিষ্কার নয়, যদিও অনেকে ধারণা করে এবং বলে থাকে যে, ১১ই সেপ্টেম্বর-এর হাইজ্যাকারদের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তিনি সেই মহান আলেমদের মাঝে অন্যতম, যাঁরা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্কে মুসলিম উম্মতের উপর কুফ্ফার অধিকৃত মুসলিম ভূখন্ডে ফরযে আইন বলে প্রচার করে থাকেন। কেউ কেউ অবশ্য বলে যে, ইমামকে মুক্তি দেয়া হয়েছে; ইয়েমেনের রাস্তায় রাস্তায় এ কথা শোনা যাচ্ছে। যদি তাই সত্য হয়, তবে আল্লাহ্ যেন তাঁকে শত্রুর কণ্ঠনালী আরও কঠিন ও রূঢ়ভাবে চেপে ধরার তৌফিক দেন! আমীন।

সম্পাদকের মন্তব্য

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম । আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, তিনি যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে আমাদেরকে তাঁর দ্বীন প্রচারের তৌফিক দিয়েছেন । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আসমান ও জমিনে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ **صلى ا عليه وسلم** তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল, যিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে প্রেরিত । আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সকল তাগুত ও আল্লাহ্‌র শত্রুর প্রতি আমি ঘৃণা পোষণ করি, তাদের থেকে আমি বিচ্ছিন্ন । আর আমার ভালবাসা ও আনুগত্য আল্লাহ্ , তাঁর রাসূল **صلى ا عليه وسلم** এবং মু'মিনগণের প্রতি ।

আলহামদুলিল্লাহ্, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা ধারাবাহিক শ্রুতিপূর্বক অনুলিখনের দ্বিতীয় কাজটি সমাপন করে, পুস্তিকা আকারে তা প্রকাশ করতে পেরেছি । কেবল আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও রহমতের জন্যই এ মহান উদ্দেশ্য সাধন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র স্বীকৃতি ছাড়া কোন স্বীকৃতি নেই, কেননা, তিনি আল-খালিক, আসমান ও জমিনের পরিকল্পনাকারী, এর ভিতরে বাইরে যা কিছু আছে তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন ।

যেহেতু আলোচনার বিষয়বস্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, পাঠক আশা করি বিস্তারিত পাঠ করে তা অনুধাবন করবেন, তাই আমার মনে হয়েছে, বক্তব্য বিষয়ের দলিল প্রমাণাদি পাদ-টীকায় তুলে ধরা জরুরী । দয়া করে আমাদের জন্য দো'আ করবেন, যেন আল্লাহ্, তাঁর দ্বীন প্রচারের এ প্রচেষ্টা আমাদের তরফ থেকে কবূল করেন ।

জাযা কাল্লাহু খায়রান
মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ্

আল্লাহ্ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করছেন

১) আল্লাহ্ কোন পরিণতি চাইলে, তার উপায় তিনি সৃষ্টি করবেন

এই শিরোনামটি ইমাম ইবন আসীর-এর ইতিহাস গ্রন্থ '*আল-কামিল*' থেকে নেয়া। আল্লাহ্ কোন পরিণতি বা চূড়ান্ত সমাপ্তি চাইলে, তিনি যথার্থ উপায় ও উপলক্ষ্য সৃষ্টি করবেন, যা সেই নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের জন্য বিজয় চাইলে, তিনি বিজয়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী করবেন। বর্তমানে যা কিছু ঘটছে, সেই ঘটনা প্রবাহ থেকে বিজয়ের আগাম বার্তা পাওয়া যাচ্ছে।

উপরোক্ত বিধানটি সঠিক বলে প্রতীয়মান হলে আমরা যাচাই করে প্রমাণ করতে সক্ষম হব যে, অভীষ্ট লক্ষ্য বা পরিণতি সঠিক ও উপযুক্ত পথে ধাবিত হচ্ছে। বিজয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ ধারণা হল, চূড়ান্ত পরিণামে, এই উম্মতের বিজয় অর্জিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনে এবং রাসূল **صلى ا عليه وسلم** হাদীসে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই প্রতিশ্রুতিতে আমাদের সবার *ইয়াক্বীন* তথা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা উচিত। ইয়াক্বীনের বিষয় আসলে আকীদাহ্‌র সাথে সংশ্লিষ্ট। মুসলিম হিসেবে আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, এই উম্মাহ্ চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে তা কেউ অস্বীকার করলে বুঝতে হবে, তার ঈমানে সমস্যা রয়েছে। কেন? কারণ এর পক্ষে অকাট্য দলিল প্রমাণাদি রয়েছে। তার কতিপয় নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَقَد كَتبنا في الزبور من بعد الذكْر أن الأَرض يرثُها عبادي الصالحونَ

"আমরা পূর্ববতী উপদেশের (তাওরাত) পর যবূর-কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকার ও কর্তৃত্ব লাভ করবে।"

[সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ১০৫]

সুতরাং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون
وإن جندنا لهم الغالبون

"আমার বান্দা ও রাসূলগণের ব্যাপারে এই কথা সত্য হয়েছে যে, তাঁরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে; এবং আমার বাহিনীই (সর্বশেষে) বিজয়ী হবে।"

[সূরা আস-সাফফাত ঃ ১৭১-১৭৩]

আল্লাহ্ নবীদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি তাদের বিজয় দান করবেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ...

"...নিশ্চয়ই এই পৃথিবী আল্লাহ্‌র; তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে খুশি তিনি কর্তৃত্ব দান করেন, তবে চূড়ান্তভাবে মুত্তাকীগণ এর কর্তৃত্ব লাভ করবে।"

[সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১২৮]

অর্থাৎ আল্লাহ্ জমিনের কর্তৃত্ব মু'মিন বা কাফির যাকে খুশি দান করেন কিন্তু আয়াতের শেষে মুত্তাকী মু'মিনদের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব লাভের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يريدون أنْ يطفئوا نور الله بأفْواههم ويأبى الله إلا أنْ
يتم نوره ولو كره الكافرون

“ওরা চায় ফুৎকার দিয়ে আল্লাহ্‌র আলো নিভিয়ে দিতে, কিন্তু আল্লাহ্ তা পূর্ণাঙ্গ করবেনই কাফিরদের নিকট যতই তা ঘৃণা ও গাত্রদাহের কারণ হোক ।”

[সূরা আত-তাওবাহ্ ঃ ৩২]

কাফিরগণ প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে আল্লাহ্‌র আলো নির্বাপিত করতে; আল্লাহ্‌র আলো হল ইসলাম; মুহাম্মদ **صلى ا عليه وسلم** এর *রিসালাহ্* । ওরা চায় ইসলামের ধারা প্রতিহত করতে আর আল্লাহ্ বলেন যে, ওদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে । ইসলামের উপর আঘাত হানার জন্য ওরা যে অঢেল অর্থ সম্পদ ব্যয় করে, তা সত্যিই অবাক করার মত । ভেবে দেখুন, আল্লাহ্ ওদের কত নিয়ামত দান করেছেন, ওদের হাতে কত সহায় সম্পদ রয়েছে অথচ সবকিছুই ওরা বিনিয়োগ করছে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য? কখনও আমরা অনুযোগ করে বলি, ওরা মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে, পৃথিবীর তাবৎ বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র ওদের মুখপাত্র, সকল ক্ষমতাধর রেডিও স্টেশন ওদের দখলে, পৃথিবীর প্রভাবশালী মিডিয়া ওদের কব্জায়, সরকার ও পুলিশ বাহিনী ওদের বশীভূত; এক কথায় পৃথিবীর যাবতীয় কলকাঠি ওরাই নাড়ছে । ওদের হাতে যাবতীয় অর্থকড়ি, সহায় সম্বল । আমাদের কোন সুযোগই নেই ওদের বিরোধিতা বা সংগ্রাম করার, তাই আমাদের উচিত সংগ্রামের পথ পরিহার করে বিকল্প কোন উপায়ে ওদের মোকাবিলা করা; সম্মুখ সমরে আমাদের যাওয়া উচিত নয় যেহেতু কোনভাবেই আমরা ওদের সমকক্ষ হতে পারব না! বরং রাজনীতি ও কূটনীতির আশ্রয়ে ওদের মোকাবিলা করা শ্রেয় । কিন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

فَسينفقُونها ثُم تكُونُ عليهم حسرةً ثُم يغلبونَ

“...বস্তুতঃ এখন ওরা আরও ব্যয় করবে । তারপর তাই ওদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত ওদের পরাজিত করা হবে ...” *[সূরা আনফাল ঃ ৩৬]*

সুতরাং ওরা ওদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করুক, যেহেতু এভাবেই ওরা পরাজিত হবে । উপরোক্ত আয়াতের অর্থ অনুযায়ী, প্রথমে ওদের অর্থ সম্পদ ব্যয়িত হবে, অতঃপর ওরা পরাজিত হবে । ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযানে ওরা যখন বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে,

তখন আমাদের বরং খুশি হওয়া উচিত। কেননা, তা নির্দেশ করে যে, ইসলামের বিজয় আসন্ন। নির্ধারিত পথেই ঠিকঠাক মত ইসলামের বিজয় ঘনিয়ে আসছে।

আমেরিকা এখন অকপটে স্বীকার করছে, ভিয়েতনাম ও কোরিয়ান যুদ্ধের তুলনায় আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধে ওদের কত বেশি অর্থের যোগান দিতে হয়েছে। কোরিয়ান যুদ্ধ ও ভিয়েতনাম যুদ্ধে ওদেরকে যথাক্রমে ২০০ ও ৪০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। ইরাক যুদ্ধে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ইতিমধ্যে ৮০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে; এখনও যুদ্ধ অব্যাহত আছে। মার্কিন অর্থনীতি ক্রমশ মুখ থুবড়ে পড়ছে। এভাবেই সম্পন্ন হবে উক্ত আয়াতের অর্থের বাস্তবায়ন; অর্থাৎ ওরা অগণিত অর্থ সম্পদ ব্যয় করে পরিশেষে অনুশোচিত হবে। ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধ আরোপিত ছিল না, কেউ ওদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়নি বরং ওরা নিজেরাই যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। অহেতুক সমস্যায় জড়ানোর কারণে, ওরা আফসোস করবে; অঢেল অর্থ সম্পদ ব্যয় করেও ওদের শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের মাশুল গুণতে হবে।

আমেরিকার যুদ্ধংদেহী মনোভাবের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় আবু জাহলের ঘটনায়, যখন সে বদরের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করতে চেয়েছিল। মুসলিমগণ কাফিরদের বাণিজ্য কাফেলা তাড়া করতে উদ্যত হয়, কিন্তু কাফেলা নিরাপদে থাকায়, আবু সুফিয়ান তৎকালীন কাফির বাহিনী প্রধান আবু জাহলকে মক্কায় ফিরে যেতে বলে এবং যুদ্ধ এড়ানোর পরামর্শ দেয়। উদ্ধত, দুর্বিনীত আবু জাহল বলে, "না, আমরা তাদের মোকাবিলা করতে অগ্রসর হব! আমরা বদরে যাব, সেখানে তিনদিন আনন্দ ফূর্তি করব, মদ্য পান করব, মহিলারা আমাদের জন্য গান বাদ্য করবে। সমস্ত আরববাসীগণের অভিযানের কথা জানিয়ে দিতে চাই যেন তারা বুঝতে পারে যে কুরাইশদের দমানো বা লাঞ্ছিত করা সম্ভব নয়।" কাফিরগণ সেখানে তিন দিন আমোদ ফূর্তি করবে এবং এ খবর সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়বে, কুরাইশদের সাথে এরপর কেউ যেন লড়তে সাহস না পায়।

আবু জাহল যেরূপ যুদ্ধ বেছে নিয়েছিল, বর্তমানে আমেরিকা আবু জাহলের ন্যায় ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করছে; ওরা নিজে থেকে এই যুদ্ধ বেছে নিয়েছে। এ যুদ্ধের পরিণাম

আমদের সবার জানা, যেহেতু রাসূল **صلى ا عليه وسلم** হাদীসে কুদসীতে বলেন যে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ***"যে কেহই আমার আওলিয়াকে শত্রু হিসেবে গণ্য করবে, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"*** (হাদীসে কুদ্সী ২৫; আল-বুখারী)

সুতরাং মুসলিমরা নয় বরং আল্লাহ্ তা'আলা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন! আমেরিকা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে স্পর্ধামূলক যুদ্ধ কর্মে লিপ্ত!

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وعد الله الذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات ليستخلفَنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركُونَ بي شيئًا ومن كفَر بعد ذَلك فَأولئك هم الفَاسقُونَ

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে; আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন, যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর কেউ অকৃতজ্ঞ হলে, ওরা অবশ্যই পাপাচারী।" *[সূরা আন-নূর ঃ ৫৫]*

খিলাফাহ্ (শাসনকর্তৃত্ব) তাদের দেয়া হবে যারা ঈমান আনয়ন পূর্বক সৎকর্ম করবে। মুসলিমগণ বর্তমানে ভয়ভীতির মাঝে দিন অতিবাহিত করছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করবেন। তিনি এই উম্মতকে খিলাফত ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; এবং এ দুনিয়াতে চূড়ান্তভাবে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে।

২) খিলাফত ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন, বর্তমান সময়ের বা কালের জন্য আফসোস করা সমীচীন নয়

আমরা নিশ্চয়ই এই হাদীস জেনে থাকবো যেখানে মানব ইতিহাসের পর্যায় বা ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূল **صلى ا عليه وسلم** বলেনঃ *"রিসালাহ্ তোমাদের মাঝে ততদিন থাকবে, যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন, পরে তা তুলে নিবেন। এরপর আসবে খিলাফাহ্ রাশিদার যুগ যা রিসালাতের নীতিতে চলবে। আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন তা তোমাদের মাঝে বিরাজ করবে, পরে তা তুলে নেয়া হবে। এরপর শুরু হবে বংশানুক্রমিক নেতৃত্ব (রাজত্ব), আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন তা ততদিন তোমাদের মাঝে বিরাজ করবে; পরে তিনি চাইলে তা তুলে নিবেন। তারপর শুরু হবে ফিৎনা-ফ্যাসাদের যুগ, যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন, তা বিদ্যমান থাকবে, অতঃপর তা অপসারণ করবেন। তারপর ফিরে আসবে খিলাফাহ্ রাশিদাহ্ যা রিসালাতের অনুগামী হবে।"* এরপর তিনি [রাসূল **صلى ا عليه وسلم**] চুপ করলেন।[১]

হাদীসে বর্ণিত রিসালাতের যুগ রাসূল **صلى ا عليه وسلم** এর তিরোধানে সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে খিলাফায়ে রাশিদার যুগ যা আবু বকর **رضي ا عنه** হতে আলী **رضي ا عنه** সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর পর্যায়ক্রমে আসে রাজতন্ত্র, উমাইয়া, বনু আব্বাস, খিলাফায়ে উসমানিয়ার যুগ। তারপর হবে ফিৎনা, ফাসাদ, স্বৈরতন্ত্রের যুগ। আমরা বর্তমানে এই যুগে বসবাস করছি। তারপর পুনরায় ফিরে আসবে খিলাফায়ে রাশিদা। এভাবে পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে, রাসূল **صلى ا عليه وسلم** যেহেতু শেষে মৌনাবলম্বন করেন, তা থেকেই এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কখনও আমরা সময়ের বা কালের অভিযোগ করে বলি যে, আমরা সবচেয়ে খারাপ সময়ে বসবাস করছি যখন উম্মাহ্ দুর্বল, অসহায়, পরাজিত, বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত। আমরা যদি সাহাবীগণের যুগে বসবাস করতাম কিংবা ইসলামের স্বর্ণলী যুগে থাকতাম।

---

[১] মুসনাদ ইমাম আহমেদ খন্ড- ২৭৩, নুমান ইবন বাশীর **رضي ا عنه** থেকে বর্ণিত।

নিম্নলিখিত কারণে আমাদের কালের বা সময়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা উচিত নয়ঃ-

<u>**প্রথম কারণঃ**</u> জনৈক তাবেঈ একজন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূল **صلى ا عليه وسلم** যখন আপনাদের মাঝে ছিলেন, তাঁর সাথে আপনারা কী রূপ আচরণ করতেন?” উত্তরে সাহাবী বললেন কিভাবে তারা রাসূলের সাথে সাধ্যমত উত্তম ব্যবহার করতেন। তাবেঈ শুনে বললেন, “রাসূল **صلى ا عليه وسلم** -কে আমাদের জীবদ্দশায় পেলে তাঁকে ঘাড়ে তুলে বহন করতাম।” তাবেঈ আসলে যা বুঝাতে চেয়েছেন তা হল সাহাবীগণ রাসূলের সাথে যথাযথ আচরণ করেনি; যদি তাঁর সময়ে রাসূল **صلى ا عليه وسلم** জীবিত থাকতেন, তবে তিনি রাসূলের সাথে তাদের চেয়েও উত্তম আচরণ করতেন। উত্তরে সাহাবী বললেন, “কেউ জানে না, সে সময় জীবিত থাকলে সে কী করত; আমাদেরকে নিজের বাবা-ভাইয়ের বিপক্ষে জিহাদ করতে হয়েছে, যা কখনই সহজ কোন ব্যাপার ছিল না। আর এখন তোমাদের পিতা, ভাই, পরিবার, পরিজন মুসলিম; তুমি কেবল ধারণা করছে যে, রাসূল **صلى ا عليه وسلم** এর সাথে এ ধরণের আচরণ করতে। অতএব এমন কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করবে না, যা আল্লাহ্ তোমার তাকদীরে নির্ধারণ করেনি।”

<u>**দ্বিতীয় কারণঃ**</u> আমাদের বর্তমান সময় নিয়ে অভিযোগ করা উচিত নয়; বরং বর্তমান সময়ে বাস করার জন্য আমাদের আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কেন? মুসলিম উম্মতের মাঝে সাহাবীগণের মর্যাদা সর্বোচ্চ, এরপর তাবেঈগণ এবং এরপর তাবে-তাবেঈগণ। সাহাবীগণের মর্যাদা যে কারণে সবচেয়ে বেশি তা হল, তারাই ইসলামের ভিত্তিমূল রচনা করেন। তারা পুরোপুরি শূণ্য অবস্থা থেকে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর অন্যদিকে পরবর্তী প্রজন্মের সময়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিতই ছিল, তারা কেবল এর বিকাশ লাভে অবদান রেখেছেন। কোথাও কোন বিদ'আতের আবির্ভাব ঘটলে তারা তা বিদূরিত করতেন, কিন্তু সাহাবীগণের রচিত ইসলামের ভিত তখন বর্তমান ছিল। এ কারণেই সাহাবীগণ শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, কেননা তাদের ত্যাগ ছিল সবচেয়ে বেশি আর কাজও ছিল সবচেয়ে কঠিন।

আমাদের জন্য যে বিষয়টি জরুরী তা হল, সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা। কেননা, একেক প্রজন্মে কাজের গুরুত্ব ও প্রকৃতি একেক রকম। বিষয়টি আরও পরিষ্কার

করে বলতে গেলে, ইমাম বুখারী যদি একশ বছর পর এসে একই কাজ করতেন, তবে তাঁর মর্যাদা আমাদের কাছে এখনকার মত হত না। ইমাম শাফেয়ীও যদি একশ বছর পরে এসে, একই কাজ করতেন, তবে তার মর্যাদাও আমাদের কাছে বর্তমানের মত হত না। কেন? কারণ কাজের চাহিদা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ফিক্বহ্এর চার ইমাম একই শতকে বসবাস করেন। আর হাদীসের ছয়জন ইমামও ঐ একই শতকে বসবাস করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, একটা সময়ে ফিক্বহ্এর প্রয়োজনীয়তা ছিল সবচেয়ে বেশি আর অন্য সময়ে হাদীসের। এ কথাটি বলার কারণ, আমরা যদি সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে ইসলামের সেবা করতে চাই, তবে বর্তমান সময়ের চাহিদা আগে উপলব্ধি করতে হবে।

আমরা দেখি যে, কতিপয় দ্বীনী ভাই দা'ওয়াতের উপর জোড় দেয় আবার কেউ হয়তো বা ইলমের উপর। আমাদের এ সকল দিকে জোড় দেয়া উচিত তবে চাহিদার নিরিখে বলতে গেলে সাহাবীগণের সময়ের সাথে বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয় কাজের মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা, বিগত চৌদ্দশ বছরে আমরা জাহেলিয়াতের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে গেছি।

আমরা যদিও বর্তমান সময়ের অভিযোগ করে থাকি, তথাপি সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে বর্তমান প্রজন্মের অবস্থা ও কাল সাহাবীগণের অবস্থা ও কালে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যদিও বা হুবুহু এক ও অভিন্ন নয়। কেননা, সাহাবীগণের প্রজন্মের শুরুতে কোন ইসলামিক হুকুমত ছিল না আর বর্তমানেও নেই, কিন্তু বিগত চৌদ্দশ বছরে অবস্থা এরূপ ছিল না। সাহাবীগণকে তাদের সময়কার দুই বৃহৎ পরাশক্তি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যসহ চুতপার্শ্বের সমগ্র আরব শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয়েছে। বর্তমানে আমাদের অবস্থাও একই রকম, কিন্তু বিগত চৌদ্দশ বছরে অবস্থা এরূপ ছিল না। পূর্বে যখন ইসলামী হুকুমত ছিল তখন সৎকাজে/সত্যের ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করত এবং হিজরত করার মত উপযুক্ত স্থান ছিল। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে, সারা পৃথিবী আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, যা সাহাবীগণের সময়কার অবস্থার অনুরূপ। ফলে, বর্তমান সময়ে সৎকাজের প্রতিদান বহুগুণ বেশি হবে। আমরা বলছি না যে, এই প্রতিদান সাহাবীগণের সমান তবে তা হবে নিঃসন্দেহে অনেক বেশি ও মাহাত্ম্যপূর্ণ।

একারণে রাসূল **صلى ا عليه وسلم** বলেছেন, ***“শেষ যামানার কতক লোকের আমলের প্রতিদান বা আজর হবে তোমাদের ৫০ জনের সমতুল্য”*****, সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আমাদের ৫০ জন না তাদের ৫০ জন?” রাসূল বললেন, *“তোমাদের ৫০ জন”*** ।

সুতরাং, ১ ওয়াক্ত সালাত সাহাবীগণের ৫০ ওয়াক্ত সালাতের সমতুল্য হবে। তোমরা ১ দিন সিয়াম পালন করে ৫০ জন সাহাবীগণের সিয়াম পালনের সওয়াব পাবে। আমলের প্রতিদান ৫০ গুণ বেশি হবে, কিন্তু কেন? কারণ সে সময়টি হবে ভীষণ সঙ্কটময়। রাসূল **صلى ا عليه وسلم** বলেছেন, শেষ সময়ে কতিপয় লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা এই উম্মতের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। হাদিসে রাসূল **صلى ا عليه وسلم** বলেন, ***“আদেন-আবিয়ান[২] হতে ১২০০ লোকের আবির্ভাব হবে যারা আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করবে। আমার পরে যত লোক আসবে তন্মধ্যে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ।”***

অতএব, রাসূলের **صلى ا عليه وسلم** পর বিগত শতকসমূহের মাঝে তারাই উম্মতের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ তাদের সময়ে অবস্থা ও পরিস্থিতি সাহাবীগণের সময়ের অনুরূপ। তাহলে *হাসানাহ*[৩] অর্জনের বর্তমান সুবর্ণযুগে বসবাস করতে আপত্তি বা অভিযোগ থাকবে কেন? কখনও সময় এমন যায়, যখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থাকে, প্রায় সকলেই থাকে অবস্থাপন্ন, আবার যখন অর্থনীতিতে মন্দাভাব দেখা যায়, মানুষ পরিতাপের সাথে ভাবে ও আশা করে, সুদিন ফিরে পেলে তারাও পূর্বসূরীগণের ন্যায় স্বচ্ছল হতে পারত। আমলের দিক বিবেচনায় আমরা এমনই উর্বর সময়ে বসবাস করছি; কিন্তু আমাদের তা উপলব্ধি করতে হবে, কী পরিমাণ সওয়াব অর্জনের সুবর্ণ হাতছানি আমাদের সামনে রয়েছে যদি আমরা এ ব্যাপারে তৎপর ও সচেষ্ট হই। সময় ও পরিবেশ প্রতিকূল না হয়ে যদি সহজ সাবলীল হয়, সে ক্ষেত্রে স্বভাবতই সওয়াব কমে যাবে। কঠিন সময় ও পরিস্থিতিতে সৎকাজের প্রতিদান বেড়ে যায়। তাহলে সময়ের অভিযোগের কারণ কোথায়, যখন বর্তমান সময়ই সর্বোকৃষ্ট?

---

[২] দক্ষিণ ইয়েমেন, বর্তমানে সেখানে স্থানীয়ভাবে সক্রিয় জিহাদী তৎপরতা রয়েছে।

[৩] সওয়াব, পুণ্য, প্রতিদান বা নেকি।

শেষ সময় যখন বিজয় প্রায় দ্বারপ্রান্তে, অদৃশ্যের বিষয়ে আল্লাহ্ই ভাল জানেন, রাসূল **عليه وسلم ا صلى** বিজয়ী মু'মিনদের দলটি সম্পর্কে বলেন, তারা ইমাম মাহদীকে, ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)কে বিজয়ী করবে; আমরা হয়ত সেই সময়ের অতি নিকটে বসবাস করছি, প্রতিদানও আশা করি হবে সেই অনুপাতে। আর যখন সবকিছু ঘটে চলছে, মানুষ প্রচুর সওয়ার অর্জন করছে তখন আমাদের ঘরে নিষ্ক্রিয় বসে থাকা অশোভনীয়, বেমানান, তাই আমাদের সময়ের দোষ না দিয়ে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত।

রাসূল **عليه وسلم ا صلى** বলেন, ***"আল্লাহ্ আমার সামনে সমগ্র পৃথিবী তুলে ধরলেন, আমি এর পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত অবলোকন করলাম এখন অবশ্যই আমার উম্মতের আধিপত্য বিস্তার লাভ করবে, যা আমার সম্মুখে তুলে ধরা হল।"*** [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৮৯, সাওবান **عنه ا رضي** হতে বর্ণিত]

সুতরাং এই দ্বীন কায়েম হবে প্রতিটি মহাদেশ, প্রতিটি দেশ, এমনকি প্রতিটি শহরে। "*লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্*"-এর ব্যানার সকল শহরে প্রবেশ লাভ করবে। এই দ্বীন ততদূর পৌঁছাবে, যতদূর দিন ও রাত হয়; দিন ও রাত হয় না এমন স্থান আছে কোথাও? সুতরাং হে কাফির, মুনাফিক, এই দ্বীন হতে পলায়ন করতে চাইলে মঙ্গলগ্রহ বা অন্য কোথাও চলে যা! এই দুনিয়ায় তোদের স্থান নেই! আমাদের স্বীকার করতেই হবে, কাঙ্ক্ষিত বিজয় সঠিক পথেই আগাচ্ছে, কিন্তু প্রশ্ন হল কখন?

৩) বিজয় অতি নিকটে

প্রথমে আমরা একটা জিনিস ধরে নেই, পরে এর সত্যতা যাচাই করে দেখি। ধরে নেই, বিজয় অতি নিকটে। এবার তা প্রমাণ করার চেষ্টা করি। আমরা বিষয়টি যে মুলনীতির আলোকে পর্যালোচনা করব তা হলঃ আল্লাহ্ কোন পরিণতি চাইলে তার উপযোগী মাধ্যম ও তৈরী করবেন। এখন দেখা যাক এ মূলনীতিটি কতটুকু শুদ্ধ। সেজন্য আমরা ইতিহাস প্রসিদ্ধ কতগুলো ঘটনা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করি।

প্রথম উদাহরণঃ বুখারী শরীফে আয়েশা **رضي ا عنها** হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ **صلى ا عليه وسلم** মক্কায় দীর্ঘ ১৩ বছর দা'ওয়াহ্ দেন। সেখানে আশানুরূপ ফল না পেয়ে তিনি তায়েফে গমন করেন, কিন্তু সেখানেও তিনি বৈরী পরিস্থিতির শিকার হন। প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে তিনি বিভিন্ন গোত্রের কাছে দা'ওয়াহ্ দিতেন এবং নিদিষ্টভাবে তিনি তাদের কাছে সাহায্যের অঙ্গীকার চাইতেন, যাতে তিনি তাঁর রবের বাণী সবার নিকট পোঁছাতে পারেন। কিন্তু কেউই তাঁর কথায় পুরোপুরি সম্মত হতে পারেনি। আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন এই সুবর্ণ সুযোগ কোন গোত্র লাভ করুকঃ *আল-আওস ওয়াল-খাযরাজ*। কিন্তু কিভাবে তা হল? আওস এবং খাযরাজ গোত্রদ্বয় অন্তহীন দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তারা প্রতিদিন জেগে উঠে যুদ্ধ করত। এ রকমই ছিল তাদের জীবন। শেষমেষ তারা রণে ভঙ্গ ছিল। এই যুদ্ধ তাদের গ্রহণশীলতার চরম মাত্রায় পৌঁছাল। তাদের জীবনে এরপরে এল বুয়াসের দিন। আয়েশা **رضي ا عنها** এ প্রসঙ্গে বলেন, "বুয়াসের দিন ছিল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলের জন্য উপহার স্বরূপ" মদীনায় 'বুয়াসের' ঘটনার সময় রাসূলের মদীনার সাথে কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল না; তাহলে বুয়াসের দিন কী ঘটেছিল? এটি এমন এক দিন যেদিন দুই গোত্র মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তুমুল যুদ্ধের ফলে তারা উভয় গোত্রই নেতৃত্ব শূণ্য হয়ে পড়ে। ফলে যখন রাসূল **صلى ا عليه وسلم** তাদের নিকট আসেন, তারা ছিল নেতৃত্বহীন। কারণ তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের কেউ নিহত ও অবশিষ্টরা আহত হয়েছিল।

কুর'আনে বর্ণিত ঘটনাসমূহ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যারা নবীগণের বিরোধিতা করে তারা একটি বিশেষ শ্রেণীর হয়ে থাকে। কুর'আনে ওদেরকে '*আল-মালা*' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু কী ওদের পরিচয়? এরা হল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, হতে পারে তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মিডিয়া সম্পর্কিত কিংবা সামাজিক। এরাই আম্বিয়াদের বিরোধিতা করে। কেন? কারণ ওরা নেতৃত্ব ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা হারানোর আশঙ্কা করে। ওরা ওদের অবস্থার কোন রকম পরিবর্তন চায় না। ফলে ওরা আম্বিয়াদের দা'ওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ওরা ভাল করেই জানে আম্বিয়াগণ ওদের ক্ষমতা চূর্ণ করে আল্লাহ্‌র বিধান কায়েম করতে চায়। এমতাবস্থায় সমাজের সকলেই হবে সমান। খলিফা নিযুক্ত হবে আল্লাহ্‌র আইন কায়েম করার জন্য, কারো ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষণের সুযোগ থাকবে না।

আবু বকর আল-সিদ্দীক **رضي ا عنه**, উমর ইবন আল-খাত্তাব **رضي ا عنه** কেহই ব্যক্তি স্বার্থের কারণে নয়, বরং আল্লাহ্‌র কিতাব ও বিধান কায়েমের জন্য খলিফা নিযুক্ত হন। খলিফাকে বলা হয় '*মাসূল*' কেননা, কিয়ামতে তাঁকে দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। খিলাফতের পদে নিয়োজিত ব্যক্তি দায়িত্ব কতর্ব্য সম্বন্ধে বিচার দিবসে আল্লাহ্‌র কাছে জিজ্ঞাসিত হবে। কেহই এই পদ পেতে চাইত না; খলিফাগণকে এই পদে জোড় পূর্বক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। আবু বকর **رضي ا عنه** বাইয়াত দিতে চেয়েছিলেন উমর **رضي ا عنه**-এর নিকট । উমরের নিকট আবু বকর জোড় পূর্বক খিলাফতের দায়িত্ব হস্ত ান্তর করেন। এরপর লোকেরা খিলাফতের দায়িত্ব আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরের নিকট হস্তান্ত রের দাবি জানালে তাঁর পিতা উমর **رضي ا عنه** বলেন, "আমি চাই না আমার পরিবারের দু'জন লোক বিচার দিবসে আল্লাহ্‌র নিকট খিলাফতের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হোক।"

সুতরাং *আল-মালা* হল সেসকল লোক যারা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে। যেমনঃ ফিরআউন, কারূন, আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ। সামাজিক পদমর্যাদার কারণে ওরা অর্থ, যশ, খ্যাতি, সম্মানসহ ও বিবিধ চরম সুযোগ সুবিধা অর্জন করে। তা সত্ত্বেও ওরা ক্ষতিগ্রস্থ। ওরা নিজেদের মুক্ত ও স্বাধীনচেতা মনে করলেও মানব রচিত ব্যবস্থাধীনে প্রকৃত অর্থে কেউই স্বাধীন নয়। রাবিয়া ইবন আমীর **رضي ا عنه** যখন পারস্যে গমন করেন, পারস্যের নেতা জানতে চান, "তোমরা কেন আমাদের বাসভূমিতে এসেছ? অর্থের প্রয়োজন থাকলে তোমাদের সকলকে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করব, সুতরাং আমাদেরকে আমাদের মত থাকতে দিয়ে তোমরা চলে যাও।" জবাবে রাবিয়া বললেন, "এ রকম কোন উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আগমন করিনি। মানুষদের সৃষ্টির দাসত্ব করা হতে মুক্ত করে শুধু সৃষ্টা তথা আল্লাহ্‌র দাসত্বে নিয়োজিত করার জন্য ও ধর্মের নামে যে জুলুমের বেড়াজাল তৈরী হয়েছে তা ছিন্ন করে কেবল ইসলামের ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রেরণ করা হয়েছে। আমরা মানুষকে এই দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে এই পৃথিবী ও আখিরাতের বিশালতায় নিয়ে যেতে চাই।"

রাবিয়া ইবন আমীর **رضي ا عنه** ধর্মতত্ত্বের ছাত্র ছিলেন না, তা সত্ত্বেও অন্যান্য সকল ধর্মের জুলুম তথা অবিচারের কথা বললেন। অন্য সকল ধর্ম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন ছিল না, কারণ ওহীর জ্ঞান দ্বারা তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন যে, কেবল ইসলাম-ই ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, বাকি সকল ধর্মই যুলুম পরায়ন।

পূর্বেও নেতৃত্ব না থাকায় বুয়াসের দিন ছিল নতুন ক্ষেত্র তৈরীর প্রস্তুতি পর্ব। হজ্জে গমন করে আনসারগণ মুহাম্মদ **صلى ا عليه وسلم** -এর সম্পর্কে শুনে বলেছিলেন, "চল, আমরা এ ব্যক্তিকে আমাদের বাসভূমিতে নিয়ে যাই। আল্লাহ্ হয়ত আমাদেরকে তাঁর দ্বারা একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করবেন।" সুব্হানাল্লাহ্! নেতৃত্ব ছাড়া মানবতা টিকে থাকতে পারে না; ভাল-মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব প্রয়োজন। আর-রাহমানের বাহিনীর যেমন নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন আশ-শায়তানের বাহিনীরও। মানব প্রকৃতি আসলে এমনই; কাউকে না কাউকে আমাদের প্রয়োজন যে আমাদের পথ দেখাবে।

প্রস্তুতি পর্বের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল আনসারগণ ছিল ইহুদীদের প্রতিবেশী। ওদের নিকট আনসারগণ একজন রাসূলের আগমনের কথা জানতেন, কিন্তু সে সময় অন্য কোন আরব গোষ্ঠী এ ব্যাপারে কিছুই জানত না। আনসারগণ ইহুদীদের বলতে শুনতেন, "আমাদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করা হবে। তখন আমরা তোমাদের সেভাবে হত্যা করব, যেভাবে *আ'দ* জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল।"

ইহুদীরা আনসারদের একজন রাসূল আগমনের এবং তাদেরকে বিনাশের হুমকি দিত, যদিও বাস্তবে হয়েছিল ঠিক তার উল্টো। কোন নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে কি এসব ঘটনা পূর্ব প্রস্তুতি মূলক ছিল না? আল্লাহ্ তা'আলা চান যে, আনসারগণ মুসলিম হোক এবং রাসূল **صلى ا عليه وسلم** -এর সেবায় নিয়োজিত হোক।

সুতরাং ঘটনা পরম্পরায় তাদের প্রস্তুতি চলছিল। আনসারগণ বুয়াসের দিন যুদ্ধ করেন কোন পূর্বাপর ধারণা ছাড়াই যে, ঐ দিন তাদের ইসলামের নিকটবর্তী করতে যাচ্ছে। বুয়াসের যুদ্ধ ছিল জাহেলিয়াতের যুদ্ধ, কিন্তু তা তাদের আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ধাবিত করছিল।

২য় উদাহরণঃ আরেকটি উদাহরণ হল, যখন উমর বিন আল-খাত্তাব رضي ا عنه পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানে বাহিনী প্রেরণ করেন, সেই মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি উবায়দা আস-সাকাফী رضي ا عنه ছিলেন অত্যন্ত অকুতোভয় ও অসীম সাহসী। তাঁর প্রয়োজনাতিরিক্ত ঝুঁকি নেয়ার দরুণ আল-জিসরের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রায় হারতেই বসেছিল। সেদিন মুসলিম বাহিনীর অর্ধেক সদস্য শাহাদাত বরণ করেছিলেন। পারস্য সাম্রাজ্যেও সেসময় সুবর্ণ সুযোগ ছিল মুসলিম বাহিনীকে পুরোপুরি ঘায়েল করার; তারা মনে করেছিল, পালের হাওয়া তাদের দিকেই বইছে। মুসলিমরা এ যাবত পারস্যের যত ভূমি দখল করেছিল, সবই তারা ফিরে পেতে যাচ্ছে।

"*আত-তারীখ আল-ইসলামী*" এর গ্রন্থকার মাহমূদ শাকির বলেন, "কিন্তু আল্লাহ্ মু'মিনগণের সাথেই আছেন।" যদি মু'মিনগণ বিজয়ের শর্ত পূরণ করে, যে কোন ভাবে হোক তারা বিজয় লাভ করবেই। সংখ্যা কিংবা নিউক্লিয়ার বোমা থাকা এক্ষেত্রে কোন নির্ধারক বা শর্ত নয়। ঈমানের শর্ত পূরণ হলে আল্লাহ্ বিজয় দান করবেন। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إن الله يدافع عن الذين آمنوا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে রক্ষা করবেন ..." *[সূরা আল-হাজ্জঃ ৩৮]*

যাদের অধিক সমরাস্ত্র বা অধিক সৈন্য সামন্ত্য রয়েছে এর মানে নয় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অভিভাবক বরং তিনি তাদের অভিভাবক যাদের পূর্ণ ও দৃঢ় ঈমান আছে। আপাত দৃষ্টিতে মুসলিমরা পরাজয় বরণের সম্মুখীন হলেও আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত পরিণামের উপায় বা মাধ্যম সৃষ্টি করে দিলেন। মুসলিমদেরকে বিপদ থেকে কেবল আল্লাহ্ই উদ্ধার করেন। পারস্যের রাজধানীতে দুই প্রধান নেতৃত্ব পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, রুস্তম প্রায় অর্ধ সৈন্য সহ এক পক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে, আর অন্য পক্ষে বাকি অর্ধ সৈন্য। মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে নিযুক্ত জেনারেলকে রাজধানীতে বিবাদ মেটানোর জন্য তলব করা হয়। মুসলিমদের যেখানে পুরাদস্তুর পরাজয় ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, শত্রুপক্ষ চলে যাওয়ায় একাকী তারা সেখানে অপেক্ষা করতে

লাগল, ইত্যবসরে খলিফা শক্তি সঞ্চার ও পূর্ণ উদ্যমে আক্রমন পরিচালনা করার সুযোগ পেলেন। শত্রুপক্ষের মাঝে বিবাদ ঠিক সময় মতই ঘটেছিল কারণ আল্লাহ্ তা'আলা চেয়েছিলেন এই জমিন ইসলামের জন্য উম্মুক্ত হোক। যদিও একসময় মনে হয়েছিল যুদ্ধের ফলাফল মুসলিমদের প্রতিকূলে, আল্লাহ্ তা'আলা শেষ পর্যন্ত তাদের বিজয়ী করলেন।

৩য় উদাহরণঃ এ উদাহরণটি ক্রুসেডের ঘটনা থেকে নেয়া। সালাহ্ উদ্দিন আইয়্যুবী পবিত্র ভূমির আশপাশের মুসলিমদের সংঘবদ্ধ করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে মনস্থ করলেন। অথচ তাঁর পূর্বে কোন মুসলিম নেতাই তা করতে সাহস করেনি। ক্রুসেডাররা জেরুযালেম, আশ-শাম[৪] এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করে রেখেছিল। সালাহ্ উদ্দিন **| a ,** এ যুদ্ধের সূত্রপাত করেছিলেন। ক্রুসেডাররাও তাঁকে বেশ গুরুত্বের সাথেই নিয়েছিল, কারণ ওরা জানতে যে, তিনি কোন সাধারণ প্রতিপক্ষ নন। রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়ায় মুসিলম নেতৃবৃন্দ তাকে উম্মাদ বলতে থাকে। ওদের মতে, "রোমান সম্রাজ্য এমন মহা সমুদ্র যার কোন কূল-কিনারা নেই।" অন্য কথায়, ওরা যা বলতে চেয়েছিল তা হচ্ছে, রোমান সম্রাজ্য আমাদের উপর তান্ডব বইয়ে দেবে, কেননা ইউরোপ ছিল একতাবদ্ধ, ওদের জনসংখ্যাও ছিল প্রচুর। ওরা যুদ্ধ করছিল এক বিভক্ত উম্মতের বিরুদ্ধে। সালাহ্ উদ্দিন **| a ,** উম্মতের কিয়দাংশ নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন, কেননা উম্মাহ্ ছিল তখন শতধা বিভক্ত। তাঁর প্রতিপক্ষ ইউরোপ ছিল অধিক সৈন্যবাহিনী সম্বলিত, সুসংঘবদ্ধ। মুসলিম নেতৃবৃন্দ সালাহ্ উদ্দিন আইয়্যুবীর প্রয়াসকে স্রেফ পাগলামি বলতে লাগল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার উপর *তাওয়াক্কুল* (পূর্ণ ভরসা) রেখে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ওদের বহু এলাকা তিনি দখল করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় পোপ এই নতুন চতুর্থ ক্রুসেডে গোটা ইউরোপকে শামিল করতে লাগলো। সালাহ্ উদ্দিন আইয়্যুবীর বিরুদ্ধে ইউরোপের এই ক্রুসেড ছিল স্মরণ কালের বৃহত্তম যুদ্ধ সমাবেশ। এ ঘটনা থেকে আঁচ করা যায়, সালাহ্ উদ্দিন আইয়্যুবীর যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানের কথা জানতে পেরে, গোটা ইউরোপ চতুর্থ ক্রুসেডকে কতখানি গুরুত্বের সাথে নিয়েছিল। সাধারণ কোন জেনারেল যুদ্ধের নেতৃত্ব দিলে ধরে নেয়া হত, যুদ্ধ শত্রু

---

[৪] সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন, ইয়েমেন ও ফিলিস্তীন।

শিবিরে কম নাড়া দিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে স্বয়ং ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর রাজবৃন্দ। তারা স্বয়ং ফিলিস্তীনে গিয়ে যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যেহেতু তিন দেশের সেনাবাহিনী সমবেত করা হবে বলে ঠিক করা হয়, তাদের সম্মিলিত সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় সে সময়ের সাধারণ যুদ্ধের সংখ্যার তুলণায় বহুগুণ বেশি। কোন তথ্যসূত্র এমনও দাবি করে যে, খোদ জার্মানীর রাজা ফ্রেডরিক বারবারোসার সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ। সেসময় এই সংখ্যা শুনলে সহসা কেউ ভয়ে মূর্ছা যেত। সেনা সংখ্যা এত বিপুল ছিল যে, নৌ যুদ্ধ জাহাজ ও বাণিজ্যিক জাহাজে সকলের স্থান সংকুলান হয়নি। ফলে, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের বাহিনী জাহাজে আর জার্মান বাহিনীকে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হতে হয়। এখন দেখা যাক, আলিমগণ এই অভিযানের ব্যাপারে কি মতামত ব্যক্ত করেন।

ইবনে আসীর ا ه ر বলেন, "ওরা স্থলপথ ও সমুদ্রপথে আমাদের দিকে আসছিল। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, জার্মান রাজা তিন লক্ষ সামর্থ্যবান সৈন্যসমেত উত্তর দিক হতে রওনা হচ্ছে। মুসলিম সুলতান ও আপামর জনসাধারণ ভীত সন্ত্রস্ত হল। আলেমগণের মধ্যে অনেকেই জিহাদের প্রতি ভালবাসার দরুণ আশ-শামে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন, কিন্তু ফরাসী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা শুনে পিছু হটে যান।"

তারা কেন পিছু হটেছিলেন? সংখ্যা বেশি হলে কি ফিক্বহের পরিবর্তন হয়? তারা জিহাদের নিয়্যতে বের হয়েছিলেন, পরে সংখ্যাধিক্যের কারণে ফিরে যান, অথচ তারা ছিলেন আলেম। এখানে একটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে আর তা হল আলেমগণ নিষ্পাপ, মাসুম বা ভুলের উর্ধ্বে নন। তাঁরা নন আম্বিয়া। মানুষ অন্ধভাবে আলেমদের পিছনে ছুটলে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে, অনুসারীদের তারা সৎপথে পরিচালিত করবে। তবে সকল আলেমের ক্ষেত্রে তা সাধারণভাবে প্রযোজ্য নয়। যেহেতু ইবন আসীর ا ه ر বলেন যে তাদের মাঝে কতক ফিরে গিয়েছিলেন। এই উম্মতের মাঝে সব সময়ই একটি গোষ্ঠী বা দল হবে যাদের বলা হয়েছে '*আত-তা'ঈফাহ্*'। অধিকাংশ লোক দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পেতে আলেমগণের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলে যে, 'অমুক আলেম এরূপ কোন ফাতওয়া দেননি, অমুক আলিম জিহাদে যেতে বলেননি।' অর্থাৎ তারা আলেমগণের দোষারোপ করে, যদিও এমন আলেমগণ রয়েছেন যারা ঐ মতের বিপরীত

ও সঠিক মত প্রচার করেন; যারা সঠিক *মানহায* বা নীতি অবলম্বন করেন, তাঁরা হয়ত বা কারারুদ্ধ, নির্যাতিত, শহীদ, অন্তরীণ কিংবা কোন টিভি স্টেশনে তাঁদের খুৎবা প্রচার না করায় তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেননি। কিন্তু তাঁরাও আলেম, আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন আলেমগণের মূল্যায়ন করা হয় খ্যাতি ও যশের ভিত্তিতে, ইলমের সঠিক মানদন্ডে নয়। পূর্বে আলেমগণের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাউকে আলেম রূপে গণ্য করা হত। শিক্ষক বা উস্তাদ প্রশিক্ষণ দান শেষে ছাত্রকে আলেম হিসেবে ঘোষণা দিতেন। অধিকাংশ আলেমগণের মতে যে সর্বাধিক ইলম সম্পন্ন সেই ফতোয়া প্রদানের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হত আর এখন সরকারীভাবে আলেমদের নিয়োগ দেয়া হয়। এখন কেউ আলেমগণের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তে নয় বরং সরকারী নির্দেশে সহসাই পোষ্য আলেমে পরিণত হয়। স্যাটেলাইট চ্যানেল ও রেডিও স্টেশনে বিভিন্ন প্রোগ্রামে আবির্ভূত হয়ে বিখ্যাত আলেম হিসেবে ব্যাপক পরিচিত লাভ করে। তবে কখনোই এরূপে ইলমের মূল্যায়ন হওয়া উচিত নয়। আমাদের উচিত *আল-হক্ব* (সত্যের) অনুসরণ করা, তা যে রূপেই হোক না কেন।

ইবনে আসীর ا ه ر বলেন যে সংখ্যাধিক্যের কথা শুনে কিছু সংখ্যক আলেম পিছু হটে গিয়েছিলেন। আর আলেম হওয়ার কারণে তারা ওজর খুঁজতে দলীলের শরণাপন্ন হলেন- ভাল করেই তারা জানতেন কিভাবে আয়াত বা হাদীস বিকৃত করে তা শরীয়া অনুমোদিত বলে প্রমাণ করা যায়। তারা তাদের অপারগতার কথা এ বলে স্বীকার করবে না যে, "দুঃখিত! আমরা কাপুরুষ, তাই আমরা আর সামনে আগাতে চাই না।" বরং তারা বলবে, "জিহাদে যাওয়া *হিক্‌মাহ্* (প্রজ্ঞার) নয় এবং এর মাঝে কোন বিচক্ষণতা নেই, কিংবা সালাহ্ উদ্দিন একজন অবুঝ, আমরা তাকে বারণ করা সত্ত্বেও সে জিহাদে গিয়েছে কিংবা সালাহ্ উদ্দিনের ইলম নেই কিংবা সে ঠিকমত আরবী জানে না, সুতরাং ফতোয়া জারী করে শক্তিধর প্রতি পক্ষের মোকাবেলায় নেমে উম্মতকে সমস্যায় ফেলার কি অধিকার আছে তার? তার উচিত আলেমদের নিকট থেকে ফতোয়া নেয়া, কিন্তু সে তা করেনি। অতএব, সে তার মত যাক আর মরুক।" এভাবে আলেমরা চলে গেলো, তাতে কি হল?

নিঃসন্দেহে তা ছিল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা- আলেমদের জন্য, সালাহ্ উদ্দিনের ا ه ر জন্য এবং গোটা উম্মতের জন্য।

বিশাল বাহিনী ধেয়ে আসছিল, মুসলিমদের কেউ ছিল দৃঢ়, আর কেউ পিছু হটেছিল। এর সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় মূসা (আঃ) এবং বনী ইসরাঈলের ঘটনার মাঝে, যখন তারা সমুদ্রের নিকট উপনীত হলেন, তাদের জন্য সেটা ছিল ভীষণ এক পরীক্ষা। আল্লাহ্ মহা মহিমান্বিত চাননি মু'মিনরা ধ্বংস হোক, তিনি কেবল তাদের পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। মূসা (আঃ) ও তাঁর উম্মাহ্ এমন এক অবস্থায় উপনীত হলেন, যখন তাদের সামনে সমুদ্র আর পিছনে ফেরাউনের বিশাল বাহিনী। এ অবস্থায় বনী ইসরাঈলরা মূসা (আঃ) কে বললেন, "তুমি আমাদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলে, তুমি বলেছিলে যে, আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করবেন, হিফাজতে রাখবেন। আর আমরা এখন মৃত্যুর সম্মুখীন। আমাদের সামনে সমুদ্র আর পিছনে ফেরাউনের বাহিনী। বের হবার কোন পথ নেই। উত্তরে মূসা (আঃ) যা বললেন– আল্লাহ্ তা'আলা সেই সুন্দর ও ঐতিহাসিক উক্তি পবিত্র কুর'আনে তুলে ধরেন,

قَالَ كَلا إن معي ربي سيهدينِ

"(মূসা) বলল, কখনই নয়, নিশ্চয়ই আমার রব আমার সাথে আছেন, তিনি আমাকে অচিরেই পথ দেখাবেন।" *[সূরা আশ-শুয়ারাঃ ৬২]*

এটা এমন যেন মূসা (আঃ) বলছেন, "আমি আমার চোখকে অবিশ্বাস করি, যখন সামনে সমুদ্র ও পেছনে ফেরআউনের বাহিনীকে দেখি। আমি আমার কানকে অবিশ্বাস করি যখন বনী ইসরাঈল আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে। আমি কেবল আমার আল্লাহ্র উপর ঈমানে আস্থা রাখি; আল্লাহ্ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি তা পূরণ করবেন।" এমতাবস্থায় পরীক্ষার অবসান হল। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মূসা (আঃ) কে লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করতে বললেন। এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হল, কে ছিল দৃঢ় ও স্থির আর কে নয়।

সালাহ্ উদ্দিন আইয়্যুবীর সময়ও ছিল একই রকম এক মহা পরীক্ষা। তিন লক্ষ সৈন্যসহ ফ্রেডরিক বারবারোসা অগ্রসর হচ্ছিল। ওরা একটি নদীতে পৌঁছালেন, এর পরের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, তম্মধ্যে একটি বর্ণনা হলঃ নদীর পানি ছিল অত্যধিক ঠান্ডা, হয়ত পর্বত ছড়ায় বরফ গলার কারণে খুব ঠান্ডা ছিল। জলবায়ু ছিল ভীষণ উত্তপ্ত আর পানি অত্যাধিক ঠান্ডা। ফ্রেডরিক বারবারোসা, যে তার বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, ছিল সত্তর দশকের বয়োবৃদ্ধ। মাথা হতে পা পর্যন্ত তিনি যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত ছিলেন, ওরা মুসলিমদের ন্যায় হালকা বর্মে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করত না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء

"ওরা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। ওরা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়াল থেকে; ..."

[সূরা আল-হাশরঃ ১৪]

ওদের রক্ষাব্যুহ হতে পারে কোন দুর্গ বা বর্ম কিন্তু যেই মাত্র ওদেরকে যুদ্ধ পোষাক, রক্ষাব্যুহ, খন্দক থেকে বের করে আনা হবে– খালাস, সে খতম; এ কারণে ইবনে আল-কাইয়্যিম ।ه ر বলেন, "সাহাবীগণের শরীর তাদের শত্রুদের থেকে বৃহদকায় ছিল না, তাদের প্রশিক্ষণও পর্যাপ্ত ছিল না, ছিল না তাদের ভাল বর্ম, তাদের যুদ্ধাস্ত্রও সংখ্যায় ছিল অপ্রতুল। কিন্তু সাহস ও ঈমানের চেতনায় শত্রুপক্ষ হেরে যেত, যখন এ সবের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি।"

অতএব, সাহাবীগণের মনোবল ছিল, কিন্তু শত্রুদের ছিল না। যদিও তাদের কাছে সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র, বর্ম, প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী অর্থাৎ বিজয়ের সব উপকরণই মজুদ ছিল, তথাপি মনোবলের অভাবেই ওরা হেরে যেত।

ফ্রেডরিক ঘোড়ায় চড়ে খাল পার হচ্ছিল আর হঠাৎ কেন যেন ঘোড়াটি ভয় পেয়ে লাফ দিল। ফ্রেডরিক বারবারোসা শীতল পানিতে পড়ে হার্ট এ্যাটাকে মারা গেল। এ

প্রসঙ্গে ইবনে আসীর ر ه ا ঠাট্টা করে বলেন, "জার্মানীর রাজা এমন পানিতে মারা গেলেন যার উচ্চতা হাঁটু সমানও নয়।"

ফ্রেডরিক বারবারোসার নামেই সবার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হত। ইউরোপীয় রাজাদের মধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর, অথচ সেই কিনা এতটুকু পানিতে মারা গেল। এরপর ইবন আসীর ر ه ا বলেন, "রাজার মৃত্যুর পর ওদের মধ্যে রোগ সংক্রমন ঘটল, ওরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। যত দিনে ওরা আশ-শামে পৌঁছাল, দেখে মনে হচ্ছিল, ওরা যেন কবর থেকে উঠে এসেছে। আর যতদিনে ওরা আল-আক্কায় পৌঁছাল, তিন লক্ষ সৈন্যবাহিনী তখন মাত্র এক হাজারে নেমে এসেছে।"

ওদেরকে দেখলে মনে হবে যেন এই মাত্র ওরা কবর থেকে উঠে এল। তিন লক্ষের মধ্যে কেবল এক হাজার সৈন্য সালাহ্ উদ্দিনের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে। তো তাহলে কে অধিক জ্ঞানী ছিল? পালিয়ে যাওয়া আলেমের দল, নাকি সালাহ্ উদ্দিন আইয়্যুবী?

সালাহ্ উদ্দিন আইয়্যুবীকে বারবারোসা একটি চিঠি পাঠিয়েছিল, যাতে তার দম্ভ-অহঙ্কার ভীষণভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তাতে সালাহ্ উদ্দিন আইয়্যুবীকে হুমকি দেয়া হয়েছিল যে, যদি সে তার বাহিনী এক বছরের মধ্যে সড়িয়ে না নেয়, তবে সে এই করবে সেই করবে...। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উল্টো বারবারোসাকে-ই লাঞ্ছিত করতে চাইলেন। বারবারোসা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে পবিত্র ভূমিতে পা রাখবেই। এর আগেই যখন সে মারা গেল, পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে তার পুত্র মৃতদেহটি পানিতে সিদ্ধ করে ভিনেগার মিশিয়ে একটি ব্যারেলে সংরক্ষণ করল। তারপর মৃত দেহ পচে ব্যারেল থেকে বেরিয়ে গেল, ফলে তা পথি মধ্যে ফেলে দিতে হল। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ভূমিতে পৌঁছবার প্রতিজ্ঞাটিও পূর্ণ হতে দেননি। আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত হতে চাইলে এমনই পরিণতি বরণ করতে হবে।

ইবনে আসীর ر ه ا বলেন, "জার্মান রাজাকে মৃত্যু দান করে আল্লাহ্ যদি এই উম্মতের উপর রহম না করতেন, তবে আজ হয়ত আমরা বলতাম যে মিশর ও সিরিয়া একসময় মুসলিম অধ্যুষিত ছিল।" তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, আমরা হয়ত আশ-শামের

সাথে সাথে মিশরকেও হারাতাম আর বলতাম যে, এক সময় সেসব এলাকায় মুসলিমরা বসবাস করত। এটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যাপার ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের বিজয় দিতে চেয়েছিলেন। অতএব, ওরা তিন লাখ বা তিরিশ লাখ যত সৈন্য-ই পাঠাত না কেন, তাতে কোন লাভই হত না, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকেই বিজয় দিতে চেয়েছিলেন।

অতঃপর বলা যায়, যদি আল্লাহ্ তা'আলা যদি এই উম্মতেকে পরিণামে বিজয় দিতে চান, তবে এই বিজয় সংঘটিত হওয়ার যাবতীয় ক্ষেত্রও তিন তৈরী করবেন।

(৪) ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে

আমাদের পূর্ব আলোচিত বিষয় 'বিজয় অতি নিকটে' ইতিহাসের আলোকে সমর্থিত হওয়ায় বর্তমানের প্রেক্ষাপটে আমরা বিষয়টি যাচাই করে দেখি।

প্রথম বিষয়ঃ আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যা সালাহ্ উদ্দিন আইয়্যুবীর সময়ের সাথে তুলনীয়। তার মানে কি এই দাঁড়ায় যে, পরবর্তীতে সে রকমই ঘটবে যা সে সময় ঘটেছিল? সালাহ্ উদ্দিন আইয়্যুবীর বিজয় অর্জনের পূর্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা যাক- সে সময় উম্মাহ্ ছিল বিভক্ত। ইবনে আসীর ر ه ا বলেন, "সে সময় খিলাফাহ্ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল ও নাজুক, প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র তখন স্বাধীনতা অর্জন করছিল। খিলাফাহ্ শুধু বাগদাদেই শাসনকার্য পরিচালনা করছিল, ফলে উম্মাহ্ ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত। খলিফা কেবল বাগদাদে শাসন করছিলেন। বসরায় শাসন প্রধান ছিলেন ইবনে রা'ইক, খুজিস্তানে আবি আব্দিল্লাহ্, পারস্যে ইমাদ আদ-দৌলা, কারমানে আবি আলী বিন মুহাম্মদ, আল-মসূল, আল-জাজীরা, আল-দিয়াবাক্কারে রাবিয়া ইবনে হাব্বান, মিশর ও আশ-শামে মুহাম্মদ বিন বাযক, আফ্রিকা ও আল-মাগরিবে আল-কা'ইম ইবনে মাহদী, খোরাসানে আস-সামানী। তাহলে দেখা যাচ্ছে, উম্মাহ্ সেসময় কি রকম বিক্ষিপ্ত ছিল; আমরা যে সময়ে বাস করছি বর্তমানে উম্মতের অবস্থা একই রকম।

প্রথম কথা হল, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। উম্মাহ্ এমন সময় পার করে এসেছে যখন পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল বর্তমানের অনুরূপ। এমন নাজুক পরিস্থিতির সত্ত্বেও উম্মতের বিজয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল। সুতরাং আশাহত হয়ে এরূপ ধারণা করার কোন কারণ নেই যে, আমাদের পরিস্থিতি বেশ নাজুক, সঙ্কট উত্তরণের কোন পথ খোলা নেই। তা আদৌ সত্য নয়। তলায় নামতে নামতে চূড়ান্ত গভীরতায় পৌঁছালে উত্থান ছাড়া আর যাবার পথ থাকে না, আমাদের বেলায়ও ঘটেছে তাই। আমরা তলানিতে এসে ঠেকেছি।

ইবনে আসীর ر ه ا বলেন, "আল-আন্দালুস চারটি রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, প্রতি রাষ্ট্রের প্রধান নিজেদের আমীরুল মু'মিনীন বলে দাবী করেন। তিনি বলেন, এ ঘটনাটি কৌতুকে পরিণত হয়। সে সময় উম্মতের বিভক্তি ও বিচ্যুতি বর্তমান সময়ের তুলনায় হয়ত বেশি মাত্রায়ই ছিল। তখন ক্ষমতার মসনদের দাপট ছিল অত্যন্ত বেশি, বর্তমানে সরকার ব্যবস্থার সাথে যার তুলনা করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, আর-রিদওয়ান তার দু'ভাইকে কতল করে ক্ষমতা লাভের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে আল-বাতিনিয়্যাদের সহযোগিতা চায়। অপর একটি দৃষ্টান্ত হল, আর-রাহা নামে এক শহরকে নিয়ে দুই আমীরের মাঝে বিবাদের সূত্রপাত হয়। ওদের একজন রোমান রাজার নিকট সহায়তা কামনা করে। কুরতাবায় ফিৎনার যুগে উমাইয়া বিন আব্দুর রহমান বিন হিশাম নামে এক ব্যক্তি নিজেকে আমীর ঘোষণা করে। তাকে যখন বলা হল, বনু উমাইয়ার যুগ শেষ, উত্তরে সে বলল, "আমাকে আজকে বায়াত দাও, চাইলে কালকে আমাকে মেরে ফেল। একদিনের জন্য হলেও আমাকে আমীর হতে দাও। একদিনই আমার জন্য যথেষ্ট।" সে সময় ধনী গরীবের মাঝে ব্যাপক বৈষম্য ছিল। বর্তমানে আমাদের সময়ও উম্মাহ্ এ সমস্যায় জর্জরিত।

আরেকটি দৃষ্টান্ত হল, সুলতান মিনিকশাহ্‌র কন্যার বিয়ে, যাতে মোহরানা ধার্য করা হয়েছিল ১৩০টি উট বোঝাই স্বর্ণ ও রৌপ্য। সে সময় মানুষের এত অঢেল ধন-সম্পদ ছিল, আবার একই সময় কিছু মানুষ এত দরিদ্র ছিল যে কুকুর খেয়ে জীবন ধারণ করত। ৪৪৮ হিজরী সনে এক ব্যক্তি বিশ পাউন্ড ময়দা খরিদ করতে তার বাড়ি বিক্রী করে দেয়; সে যেকোন প্রকারে বিশ পাউন্ড ময়দা খরিদ করতে চেয়েছিল। মানুষের কর্ম স্পৃহার অভাব ও শ্রমবিমুখতা তখন ছিল অত্যাধিক। উম্মতের জন্য তা নতুন কিছু নয়,

কখনও এমন পর্যায় আসে, যখন মানুষ হয়ে পড়ে কর্মবিমুখ। ইবনে আসীর ا ه ر '*আল-কালিম*'-এ উল্লেখ করেন, ৩৬১ হিজরী সনে রোমান বাহিনী আর-রাহা নামক স্থান আক্রমন করলে একটি প্রতিনিধি দল বাগদাদে মুসলিম বাদশাহ বখতিয়ার উবওয়াইজির নিকট গমন করে। তারা সেখানে বাদশাহকে শিকার কর্মে ব্যস্ত দেখতে পান। মুসলিম উম্মতের সার্থে বাদশাহর যখন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ পরিচালনা করার কথা, সেখানে তিনি শিকার কর্মে ব্যস্ত। যাহোক মোটেও এ ঘটনা নতুন কিছু নয়; মনে পড়ে কোন এক আরব দেশের বাদশাহ ওয়াশিংটন ডি.সি. ভ্রমণে আসেন। স্থানীয় মুসলিমদের সাথে মঙ্গলবার তিনি দেখা করবেন বলে ধার্য করা হয়। নির্ধারিত দিনের ঠিক একদিন পূর্বে এ্যাম্বাসি থেকে ঘোষণা করা হয়, কোন একটি মিটিংয়ে ব্যস্ততার কারণে মঙ্গলবার তিনি আসতে পারবেন না। সাধারণ মানুষজন ধারণা করেছিল, হয়ত মার্কিন কোন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সাথে তার জরুরী বৈঠক ছিল। কোন কংগ্রেসম্যান কিংবা হবে কোন অর্থ সহায়তার আবেদন সংক্রান্ত ব্যাপার, পরে খবর পাওয়া গেল যে, সেদিন বাদশাহ্ সস্ত্রীক সিনেমা হলে চার-চারটি মুভি দেখেন। এক সিনেমা শেষ করে অপর সিনেমায় যেতে বাদশাহ্ সারাদিন ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। এখন সহজেই অনুমেয়, কোন ধরনের লোক আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। এ ধরনের কান্ডজ্ঞানহীন লোকের উপর কোন স্টোর কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য দেখা-শোনার দায়িত্ব নির্বিঘ্নে অর্পণ করা যায় না আর রাষ্ট্র পরিচালনার তো প্রশ্নই আসে না। এমনও লোক আছে যারা বলে, আমাদের উচিত তাদের আনুগত্য করা, কখনও তাদের বিরোধিতা না করা, তাদের বিরুদ্ধে কখনও কিছু না বলা। যাই হোক, তারা গিয়ে বাদশাহকে শিকারে ব্যস্ত পেল, তারা বলল যে, তিনি ভুল করছেন, তার উচিত রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। বাদশাহ্ বলল, 'আল্লাহু আকবার! চল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্য় ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার জন্য তোমরা অর্থ সংগ্রহ কর।' তারা অর্থ সংগ্রহ করে বাদশাহ্র হাতে তুলে দিলেন কিন্তু বাদশাহ্ জিহাদের কথা বেমালুম ভুলে বসলেন। নিজের শান শওকত বিলাস ও ব্যসনে সেসব অর্থ উড়াতে লাগলেন। ইবনে আসীর ا ه ر আরও বলেন, "ক্রুসেডাররা যখন আশ-শামে পৌঁছাল, আল-কাযী আবু ইবনে আম্মার সাধারণ মানুষদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য ত্রিপোলী হতে বাগদাদে গমন করেন। সেসময় বাগদাদকে প্রতীকি অর্থে খিলাফতের প্রাণ কেন্দ্র রূপে গণ্য করা হত, তাই সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজনে তারা সেখানে গমন করতেন। কাযী

সাহেব বাগদাদের কেন্দ্রীয় মসজিদে খুৎবায় উপস্থিত জনতার প্রতি জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ্‌র উদাত্ত আহ্বান জানান। মানুষজন ভীষণ উদ্দীপ্ত হয়ে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগল। সুলতানও বাহিনী প্রেরণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশায় গুড়ে বালি, তারা কেউই গিয়ে আসল না। কাযী সাহেব ব্যর্থ, ভগ্নহৃদয়ে ত্রিপোলী পৌঁছে দেখলেন ' *আল-উবাই দিয়ীন*' নামে শিয়া গোষ্ঠী ত্রিপোলী দখল করেছে। শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের শহর হারাতে হল।

সুতরাং একই রকম ঘটনা বর্তমানে আবারও ঘটলে আশাহত হওয়া উচিত নয় যেহেতু এমনটি আগেও ঘটেছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে তা পরিবর্তনও করতে পারেন।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আসন্ন পরবর্তী পর্যায়ের জন্য এই উম্মতেকে প্রস্তুত করছেন।

ইবনে কাসীর ره ا তাঁর "*আল-বিদায়া ওয়া আন-নিহায়া*" বিশ্বকোষ গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু থেকে ধ্বংস পর্যন্ত ইতিহাসের বর্ণনা দিয়েছেন। ঐ গ্রন্থে শেষ সময়ের ঘটনা সংক্রান্ত হাদীস যে অধ্যায়ে সন্নিবেশিত আছে তা '*আল-ফিতান*' শিরোনামে আলাদা বই রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

যদিও এ জাগরণে সমগ্র উম্মাহ্ শামিল হবে, তথাপি রাসূলুল্লাহ্ **صلى ا عليه وسلم** কতক স্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। রাসূল **صلى ا عليه وسلم** বলেন যে ইরাকীগণ ইমাম আল-মাহ্দীর নিকটবর্তী হবে।[৫] রাসূল **صلى ا عليه وسلم** আরও বলেন যে খুরাসান ও আশ-শাম হতে কালো পতাকাবাহীগণের আবির্ভাব ঘটবে। হাদীসের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আশ-শামের আলোচনা করা হয়েছে। ফিলিস্তীন, সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেন, জর্ডান এই রাষ্ট্র সমূহ আশ-শামের অন্তর্ভুক্ত।[৬]

---

[৫] ইমাম আনওয়ার ইরাক ও ইমাম মাহ্দী সম্পর্কে যা বলেছেন তা পুরোপুরি বোধগম্য নয়, হাদীস হতে যা পাওয়া যায়, আমরা সেই তথ্যের উপর নির্ভর করি।

[৬] ছাওবান **رضي ا عنه** হতে বর্ণিত যে রাসূল **صلى ا عليه وسلم** বলেন, ***'তোমাদের সম্পদকে কেন্দ্র করে তিনজন একে অপরকে হত্যা করবে - তারা প্রত্যেকেই ভিন্ন খলিফার পুত্র কিন্তু***

আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে এ অঞ্চল সমূহে কি রূপ সামাজিক অবস্থা বিরাজ করছিল? ইরাকে শাসন করছিল ধর্ম বিদ্বেষী ও নাস্তিক্যবাদী বাথপার্টি। আরব ভূখন্ডে ইরাকী জনগোষ্ঠী ছিল সবচেয়ে ধর্মবিমুখ। ওরা ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাথ পার্টিকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। ওরা ছিল পুরাদস্তুর জাতীয়তাবাদী। আমি এক সময় বলতাম, "*সুবহানাল্লাহ্!* আল্লাহ্-ই ভাল জানেন, ইরাকে কখন পরিবর্তন আসবে, হয়ত আজ থেকে বহু দীর্ঘ সময় লাগবে।"

জিহাদ শুরু হওয়ার পূর্বে খোরাসান ছিল কমিউনিজম দ্বারা প্রভাবিত; কমিউনিজম তাদের কি কল্যাণ সাধন করেছে? আশির দশকের গোড়া থেকে খোরাসানে জিহাদের কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

আশ-শামের কেন্দ্র ছিল ফিলিস্তীন। সে সময় ফিলিস্তীনীরা আল্লাহ্ তা'আলা ও ইসলামকে কটাক্ষ করত, অভিশাপ দিত। ওদের দুর্নীতি ও মদ্যপানের কথা সবাই জানত। এক সময় তা ছিল ফাসাদের রাষ্ট্র। সিরিয়াও শাসন ক্ষমতায় ছিল বাথপার্টি। লেবাননের অপর নাম ছিল "মধ্যপ্রাচ্যের প্যারিস", সেখানে নিয়মিত অশ্লীল উৎসব-অনুষ্ঠান চলত। আরবরা পার্টি উদযাপন করতে বৈরুতে যেত। হাদীসে ইয়েমেনের যে অংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল দক্ষিণের "*আদেন-আবিয়ান*" আর আরব

কেহই তার (সেই সম্পদের) গ্রহীতা হতে পারবে না। অতঃপর পূর্ব দিক হতে কালো পতাকার আবির্ভাব ঘটবে আর তারা তোমাদের এমন ভাবে হত্যা করবে যেমন পূর্বে অন্য কোন জাতিই করেনি।' ছাওবান رضي ا عنه বলেন, 'এর পর তিনি কিছু বললেন যা আমি স্মরণ রাখতে পারিনি। এতঃপর তিনি বললেন যে রাসূল صلى ا عليه وسلم বলেন, ***'যদি তোমরা তাকে দেখ তবে তাকে তোমাদের আনুগত্যের শপথ দিবে, যদিও (তা করার জন্য) তোমাদের বরফের উপর দিয়ে হামাগুরি দিয়ে যেতে হয় কারণ অবশ্যই তিনি আল্লাহ্‌র খলিফা, মাহ্‌দী (হেদায়েতপ্রাপ্ত)। তোমরা যদি খুরাসান হতে (যুদ্ধের) কালো পতাকাগুলো দেখতে পাও তবে সেই সৈন্যবাহিনীর সাথে যোগ দিবে যদিও (তা করার জন্য) তোমাদের বরফের উপর দিয়ে হামাগুরি দিয়ে যেতে হয় কারণ অবশ্যই তা সেই খলিফার সৈন্যবাহিনী যিনি হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং জেরুযালেম পৌঁছানো পর্যন্ত তাদের কেও রোধ করতে পারবে না।'*** (ইবন মাজাহ, আল-বুসিরী, আল-হাকিম, আহমদ নুয়াইম, আদ-দাইলামী, হাসান, ইবন সুফিয়ান, আবু নুয়াইম।)

ভূমিতে এক সময় সেটিই ছিল একমাত্র কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। আমার মনে হত যে, বিজয় বুঝি অনেক অনেক দূরে..., আমি বেঁচে থাকতে বুঝি এর কথা ভুলেই যেতে হবে।

সুব্হানাল্লাহ্! বিশ বছরের মধ্যে আজ আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি।

ফিলিস্তীনেই প্রথম জিহাদ শুরু হয়; আসলে আজকের আধুনিক বিশ্বে ফিলিস্তীনই শাহাদাত বরণ করাকে (শহীদ হওয়া) এর প্রাপ্য গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়েছে। শাহাদাত অর্জনের ধারণা আধুনিক বিশ্বে ফিলিস্তীনেই শুরু হয়। আজকের ফিলিস্তীনে, শাহাদাহ্ একটি সংস্কৃতির রূপ পরিগ্রহ করেছে। একে বিয়ে শাদীর মত উদযাপন করা হয়; যখন কোন শহীদ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে, তখন তার পরিবার একটি তাবু গেঁড়ে বসে আর লোকজন তাদেরকে সম্ভাষণ ও মোবারকবাদ জানাতে আসে যেন এই মাত্র তাদের সন্তানের বিয়ে হল। অতএব, যারা দ্বীন থেকে সবচেয়ে দূরে ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর দ্বীনকে যারা অভিশাপ দিত, তারাই আজ "*শাহাদাহ্*"র অনুপম দৃষ্টান্ত তুলে ধরল। তারাই তো "*আল-আমালিয়াহ ইসতাশাদিয়াহ*"[৭]-এ বিষয়টি পুনর্জাগরণ দিল, তারা এটা নতুন করে উদ্ভাবন করেনি বরং তারা এই বিষয়টি জনপ্রিয় করে তুলেছে।

আফগানিস্তান, এক সময়ের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আজ জিহাদের বিরাট ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটমান জিহাদের সাথে আফগানিস্তানের সম্ভাব্য যোগসূত্র রয়েছে। বর্তমানে যে কোন জিহাদের মূলে কোন না কোনভাবে আফগানিস্তানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এক সময়ের কমিউনিস্ট রাষ্ট্র সম্ভবত মুসলিম বিশ্বের যেখানে নিরক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি, ইসলাম সম্পর্কে যে দেশের অধিবাসীগণের

---

[৭] শহীদী হামলা (মারটারডম/ ফিদায়ী অপারেশন)ঃ আমাদের অবশ্যই একে পাশ্চাত্যের দেয়া নামে "আত্মঘাতী বোমা হামলা" বলা উচিত নয়, কেননা ইসলামে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ। বিষয়টি পুরোপুরি সংশিষ্ট ব্যক্তির নিয়্যতের উপর নির্ভর করে; যদি তাঁর নিয়্যত থাকে ইসলামের শত্রুদের হত্যা ও ধ্বংসের মাধ্যমে আল্লাহ্র বাণী সর্বোচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরা, তবে তা হবে শাহাদাহ ফী সাবীলিল্লাহ্, কোন ক্রমেই তা আত্মহত্যা নয়। শাইখ ইউসুফ আল-উয়াইরী ।a , এতদসংক্রান্ত বিষয়ে একটি বই লিখেছেন যার ইংরেজী অনুবাদের শিরোনাম "Permissibility of self-sacrificial operations : suicide or martyrdom?" আত-তিবইয়ান প্রকাশনী বইটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

জ্ঞান অপ্রতুল; যারা বড় মাপের আলেম উলামা নন– তারাই সেখানে একবিংশ শতাব্দীতে জিহাদের সূত্রপাত করল। জিহাদের পুনর্জাগরণ ও বিস্তার ঘটল সেখান থেকে; শাইখ আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ আয্যাম ا ه ر এর নির্দেশনায় আফগানিস্তান হতে গোটা বিশ্বে জিহাদ ছড়িয়ে পড়ল। কে জানত যে, ইরাকও একদিন জিহাদের ময়দানে পরিণত হবে? অল্প কয়েক বছর আগে সে কথা কে কল্পনা করত? কার ধারণায় ছিল, সাদ্দামের দেশ জিহাদের কাতারে শামিল হবে? এমনকি আমেরিকানরাও হিসাব কষতে ভুল করল; ওরা মনে করেছিল বাগদাদে ওদের ফুলের শুভেচ্ছায় বরণ করে নেয়া হবে; কিন্তু, *সুবহানাল্লাহ্*! ইরাক বর্তমানে মুসলিম উম্মতের প্রথম সারির জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরাককে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করলেন। বারো বৎসরের অর্থনৈতিক অবরোধ ও প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ সংগঠিত না হলে, ইরাকী জনগণের মাঝে আজকের মুজাহিদ ফ্রন্ট তৈরী হত না। এসব কিছু ছিল তাদের জন্য '*বুয়াস*'। আল্লাহ্ তা'আলা ইরাকীগণের জন্য একাধিক '*বুয়াস*'-এর ঘটনার অবতারণা করেন। সাদ্দাম তাদের মাঝে জীবিত থাকলে এরূপ পরিবর্তন আসত না, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পূর্বের নেতৃত্ব অপসরণ করলেন। আমেকিানরা নেতৃত্বের পদে উড়ে এসে জুড়ে বসল। তাদের জানা ছিল না যে ভীমরুলের চাক সেখানে বর্তমান ছিল, তারা জানত না কিসে তারা হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে। সাদ্দামকে হঠালেও আবু মুসয়াব আজ-জারকাওয়ী মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিতে লাগলেন।[৮] আমেরিকানরা এক মহা বিপদে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে, আল্লাহ্-ই ভাল জানে, ইরাক যেন এক অতল জলাধার যাতে নিমজ্জিত হয়ে আমেরিকার সলিল সমাধি ঘটবে।

---

[৮] আবু মুসয়াব আজ-জারকাওয়ী ইরাকে শাহাদাত বরণ করার পূর্বে এই লেকচার প্রদান করা হয়। ইমাম আনওয়ার আল-আওলাকি তার লেকচার প্রদানের সময় ইরাকে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা ও পট পরিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছেন। পূর্বের তুলনায় ইরাকে সুন্নী মুজাহিদীন দলগুলো অধিক সংগঠিত ও পরস্পর জোট বদ্ধ হয়েছে, যা '*আল-মুতায়্যিবীন*' নামে পরিচিত। মৈত্রীভুক্ত দলগুলো আবু হাফ্স (হাফিযুল্লাহ্) এর প্রতি আনুগত্য পোষণ করেছে, পাশাপাশি তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাসমূহে তারা শরীয়াহ আইন প্রবর্তন করেছে। পূর্বের বিচ্ছিন্ন অবস্থার তুলনায় বর্তমানে তাদের পরিচালিত অভিযান সমূহ অনেক বেশি সংগঠিত, পরিকল্পিত, নিয়ন্ত্রিত, লক্ষ্যভেদী ও কার্যকরী রূপে দেখা দিচ্ছে। মহান আল্লাহ্ ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যই এই ভূমিকে আবাদ করেছেন।

দক্ষিণ ইয়েমেন যা এক সময় কমিউনিস্ট আরব রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল, বর্তমানে (সেখানে ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘটেছে। আর এই পুনর্জাগরণ ঘটেছে আদেন-আবিয়ানকে কেন্দ্র করে। হাদীসে যে স্থানের কথা রাসূল **صلى ا عليه وسلم** বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাহলে বিশ বছরের স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এসব ঘটনা ঘটে চলছে। এসব কিছু কি, বিজয় অতি নিকটে এমন ইঙ্গিত বহন করে না? হাদীসে রাসূল **صلى ا عليه وسلم** যেসব স্থানের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি সেসব স্থান পরবর্তী কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত করছেন না?

ইরাক, খুরাসান, ইয়েমেন এবং আশ-শামে পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে, যার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে '*আল-মালহামা*'[৯]। রাসূলুল্লাহ্ **صلى ا عليه وسلم** ইমাম মাহদী ও *আল-মালহামা* সম্পর্কে উপরোক্ত স্থানসমূহের উল্লেখ করেছেন। *আল-মালহামা* হচ্ছে সেই মহান যুদ্ধ যা মুসলিম এবং আর-রোমের মধ্যে সংঘটিত হবে, যার ফলশ্রুতিতে খিলাফাহ্ সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা যে বিশ্বে বসবাস করি সেখানে আঞ্চলিক ভাবে খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠা সম্ভব না; হয় সর্বত্র জয় করতে হবে নতুবা সবকিছু হারাতে হবে। যদি কেউ মনে করে সীমিত কোন এলাকা সে দখল করবে আর তাকে একাকী ছেড়ে দেয়া হবে, তবে তা ভুল কেননা, আমেরিকা তাকে উৎখাত করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে।

বর্তমানে বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র সমূহের ব্যাপক বিধংসী শক্তি অর্জনের পূর্বে মানব সভ্যতার অবস্থা এরূপ ছিল না। পূর্বে কেউ চাইলে পর্বতে বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করে বছরের পর বছর নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারত; কিন্তু এখন ওরা বি-৫২ (বোমারু বিমান) পাঠিয়ে প্রাসাদ নিমিষের মধ্যে গুড়িয়ে দিতে পারে।

---

[৯] রাসূল **صلى ا عليه وسلم** শেষ ও বৃহৎ যে যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তার দু'পক্ষ হবে ঈসা (আঃ) ও দাজ্জালের বাহিনী; মুসলিমরা সেই যুদ্ধে বিজয়ী হবে এবং সেখান থেকে তারা সমস্ত বিশ্বে কর্তৃত্ব কায়েম করবে।

তাহলে ভবিষ্যতের যুদ্ধে হয় সম্পূর্ণরূপে বিজয় অর্জিত হবে, না হয় সবই হারাতে হবে। এটি "*আল-মালহামা*"র একটি বৈশিষ্ট্য- *আল-মালহামা* হবে কুফর ও ঈমানের মধ্যে চূড়ান্ত লড়াই, যাতে মুসলিম উম্মাহ্ বিজয় লাভ করবে। এখানেই সবকিছুর শেষ নয়, কেননা দাজ্জাল, ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব ঘটবে; কিন্তু আল-মালহামা যুদ্ধের ফলে ইসলামী খিলাফাহ্ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

এখান থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, আমরা সেই সুবর্ণ সময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এমতাবস্থায় নীরব দর্শক হয়ে হেলায় সময় নষ্ট করা এবং বিরাট আজর বা পুরস্কার হতে বঞ্চিত হওয়া আমাদের জন্য আদৌ শোভনীয় নয়। হাদীস থেকে সেই সময়ের পুরস্কারের কথা জেনে সাহাবা ও সালফে সালেহীনরাও সেসময়ে উপস্থিত থাকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন[১০]। আর আমরা জীবদ্দশায় সেই সময়ের কাছাকাছি উপনীত হয়েও অবহেলা করছি। শাইখ আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ আয্যাম **ر ه ا** এ প্রসঙ্গে বলেন, "জিহাদের উপমা হল বাজারের মত, যখন খোলা থাকে কিছু লোক মুনাফা অর্জন করে, তারপর তা বন্ধ হয়ে যায়।" সবসময় মুনাফা অর্জনের সুযোগ পাওয়া যাবে না; যদি কেউ পিছনে পড়ে থাকে, ইতস্ততঃ করে, অনীহা ভাব প্রদর্শন করে, তাহলে সে সুযোগ হারাবে, কেননা এ সুযোগ কেবল একবারই আসে।

জিহাদের সুবর্ণ সময় ও সুযোগ থাকলেও, এর পুরস্কার বিনা মুল্যে বিতরণ করা হবে না, এ জন্য তাকে কঠোর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। জিহাদের মর্যাদা সর্বাধিক বলে তাকে ত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। যারা সর্বোৎকৃষ্ট মু'মিন, আল্লাহ্ তা'আলা যাদের বিশেষভাবে বাছাই করেছেন কেবল তারাই সর্বশেষ পর্যন্ত তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারবে, কেননা সে সময় ফিৎনা হবে খুবই ভয়াবহ।

---

[১০] উদাহরণ স্বরূপ আবু হুরায়রা **رضي ا عنه** বলেনঃ "*রাসূল **صلى ا عليه وسلم** আল-হিন্দ জয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি যদি সেই সময় পেতাম, আমার জান ও মাল উৎসর্গ করতাম। শহীদ হলে শ্রেষ্ঠ শহীদদের একজন হতাম আর যুদ্ধ শেষে জীবিত অবস্থায় ফিরে এলে আমি হতাম মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা।*"- আহমাদ, আন–নাসাঈ, আল–হাকীম।

(৫) ফিৎনার চরম মাত্রা অনুধাবন করা

ফিৎনা কতখানি ভয়াবহ হবে তার কতিপয় নমুনা বা ইঙ্গিত হলঃ-

প্রথম ইঙ্গিতঃ রাসূল **صلى ا عليه وسلم** বলেন '*আল-মালহামা*'য় রোমানদের মোকাবিলা করবে যে মুসলিম বাহিনী তার এক-তৃতীয়াংশ পিছু হটে যাবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, কেবল শ্রেষ্ঠ মু'মিনগণ এই যুদ্ধে যাবে তা সত্ত্বেও এক-তৃতীয়াংশ রণে ভঙ্গ দিবে। রাসূল **صلى ا عليه وسلم** বলেছেন যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মৃত্যু পর্যন্ত তওবাহ্ কবূল করবেন না। তারা মু'মিন ছিলেন ও আল্লাহ্র রাহে বের হয়ে ছিলেন, তারা মুজাহিদ ছিলেন ও সামনের কাতারে শামিল ছিলেন, এর পরও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তওবাহ্ কবূল করবেন না। সে সময় ফিৎনা এমনই কঠিন ও ভয়াবহ হবে।

ফিৎনা থেকে নিরাপদে থাকার জন্য ঈমানে দৃঢ় ও বলীয়ান হতে হবে। ঈমানের সাথে সেসময় টিকে থাকা হবে জনমানবহীন শূন্য মরুপ্রান্তর অতিক্রম করার মতই দুঃসাধ্য। রসদ যদি পর্যাপ্ত না হয়, সওয়ারী যান নষ্ট হয়ে যায় আর গন্তব্যে পৌঁছানো না যায় তবে মৃত্যু অনিবার্য। ঈমানে একজনকে শতভাগ বলীয়ান হতে হবে। তিরিশ, পঞ্চাশ বা আশিভাগ ঈমানে ব্যতিক্রম কিছু ঘটবে না, শতভাগ ঈমান না হলে মৃত্যু অবধারিত। অর্ধপূর্ণ পাত্র হল খালি পাত্রেরই নামান্তর; পরিপূর্ণ মাত্রায় ঈমানে বলীয়ান হয়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ তা বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন এক বিশেষ মুহূর্ত, সেই সময়ের পুরস্কার হবে অন্য যেকোন সময়ের তুলনায় বহু গুণ বেশি। ঈমানে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ যারা কেবল তারাই সে সৌভাগ্য অর্জন করবে। সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাদের সেই সৌভাগ্যবান হওয়ার তৌফিক দান করেন। আমীন।

দ্বিতীয় ইঙ্গিতঃ আমরা যে সেই সময়ের দিকে এগিয়ে চলেছি তার আরেক নমুনা বা ইঙ্গিত হচ্ছে, পাশ্চাত্যে মৌলবাদের উত্থান এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী বিষয়াবলীতে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব।

'দ্যা নিউজ উইক' পত্রিকা "বুশ এ্যান্ড গড" শিরোনামে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করে যেখানে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে বলা হয়, "আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতিতে বিভিন্ন চলক ও লক্ষ্য নির্ধারণী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি হল ধর্ম। কিন্তু তারা বলেন যে আমেরিকান ইতিহাসে এই প্রথম বারের মত মনে হচ্ছে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে ধর্মীয় প্রসঙ্গ মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। বুশ একবার মাহমুদ আব্বাসকে বলেছিল, "ঈশ্বর আমাকে আফগানিস্তানে যেতে বলেছে" তাহলে কংগ্রেস বা আমেরিকান জনগণ বা সংবিধান নয়; আফগানিস্তানে অভিযানের কারণ ছিল "ঈশ্বরের আদেশ"!

ডেনমার্ক– ইউরোপের অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, যেখানে রাসূল **صلى ا عليه وسلم** কে আক্রমণ করে ব্যাঙ্গাত্মক ও শ্লেষপূণ কার্টুন ছাপানো শুরু হয়। কেউ কখনও ভাবেনি যে, ডেনমার্কের মত ছোট্ট একটি রাষ্ট্র এমন একটি বিষয় তৈরী করবে, যার ফলশ্রুতিতে ঐ ঘটনার উপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র সমূহ মুসলিম উম্মাহ্‌র বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে। পাশ্চাত্য বিশ্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে ডেনমার্ককে সমর্থন করেছে। পশ্চিমা জনগোষ্ঠীও ডেনমার্কের পাশে এসে দাঁড়ায় যার জ্বলন্ত উদাহরণ হল, সুইডিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ। তার নির্দেশে ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন ছবি সম্পন্ন ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেয়ায়, সে জনরোষের মুখে পড়ে এবং পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তাহলে পশ্চিমা জগত মুসলিমদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে ক্রমশই মৌলবাদের দিকে এগিয়ে চলেছে; এমন নয় যে ওরা হঠাৎ করে খুব ধার্মিক হয়ে গেছে– বরং ওদের কোন ধর্মের বালাই নাই, বর্তমান বাইবেলের শিক্ষা হতে ওরা বহু দূরে, কিন্তু মুসলিমদের বিরোধিতার প্রশ্নে ওরা ধর্মের আশ্রয় নিচ্ছে।

তৃতীয় ইঙ্গিতঃ খ্রীস্টান ধর্মীয় নেতাদের প্রায়ই জিঘাংসামূলক মন্তব্য করতে শোনা যায়, উদাহরণ স্বরূপ- বিখ্যাত মার্কিন খৃষ্ট ধর্ম প্রচারক বিলি গ্রাহামের পুত্র ফ্রাংকলিন গ্রাহাম রূঢ় ভাষায় বলে যে, "ইসলাম হল শয়তানের ধর্ম।" প্যাট রবার্টসন মুসলিমদের ইয়াজুজ মাজুজের সাথে তুলনা করে।

এ ধরনের মন্তব্য বর্তমানে বেড়েই চলেছে যা ইঙ্গিত প্রদান করে যে, আমরা *আল-মালহামা*-র নিকটবর্তী হচ্ছি, কেননা মানসিকভাবে প্রয়োজনীয় স্বাতন্ত্র্য ও বিদ্বেষভাব প্রকট ভাবে বিরাজ করছে। যেকোন যুদ্ধ ময়দানের পূর্বে মন মগজে প্রথম আলোড়ন

জাগায়। মন মানসিকতায় প্রথমে তোলপাড় শুরু হয়, পাশ্চাত্যে সেই প্রক্রিয়া এখন চলছে।

চতুর্থ ইঙ্গিতঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে খিলাফাহ্ প্রদানের পূর্বে মুসলিম উম্মাহ্কে বিভিন্ন স্তর বা ধাপ অতিক্রম করতে হবে, ব্যাপারটি ট্রেনে ভ্রমণের মত যেখানে পর্যায়ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়... স্টেশন অতিক্রম করতে হয়, উম্মতকেও ধাপে ধাপে কয়েকটি স্টেশন পার হতে হবে যার একটি হল - '*আল-ইবতিলা*' (ঈমানের পরীক্ষা)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أم حسِبتم أنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ الله الذين جاهدوا منكُم ولَم
يتخذُوا من دون الله ولا رسوله ولا الْمؤمنِ وليجةً

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ জেনে নেবেন তোমাদের মাঝে কে (আল্লাহ্র পথে) যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে।" *[সূরা তাওবাহ্ ঃ ১৬]*

সুতরাং জান্নাতে যাওয়ার এবং দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বে যে দু'টি স্টেশন বা ঘাঁটি অতিক্রম করতে হবে তা হলঃ *জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্* এবং *আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা*।[১১] এই দু'টি বিষয়ে সঠিক বোঝ না থাকলে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব

---

[১১] *আল-ওয়ালা* মানে আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা ও আনুগত্য। আর *আল-বারা* মানে আল্লাহ্র জন্য ঘৃণা ও পরিহার করা। অধিকাংশ মুসলিম এ সম্বন্ধে ভীষণ অজ্ঞ। তাদের অনেককেই বলতে শোনা যায় যে, 'আমাদের একে অপরকে (সব বিশ্বাস ও ধর্মের লোকদের) ভালবাসা উচিত, তাদের প্রতি সহনশীল হওয়া উচিত'। নিঃসন্দেহে এটি একটি কুফর ধারণা, যেহেতু আমাদের আনুগত্য কেবল আল্লাহ্র প্রতি; আল্লাহ্ যা ঘৃণা করেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে আমরা আদিষ্ট হয়েছি। শাইখ আবু মুহাম্মদ আসীম আল-মাকদিসী (আল্লাহ্ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুন) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চমৎকার একটি বই লিখেছেন। বইটির ইংরেজী অনুবাদের শিরোনাম

নয়। উম্মতকে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করতে হবে আর স্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তুলেতে হবে যে, তাদের *ওয়ালা* তথা ভালবাসা ও আনুগত্য আল্লাহ্, তাঁর রাসূল **صلى ا عليه وسلم** ও মু'মিনগণের প্রতি আর শয়তান ও অবিশ্বাসীদের সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকা ও তাদের হতে দূরত্ব বজায় রাখা।

কতিপয় আলেম, কিছু ইসলামী সংগঠন ও সাধারণ মুসলিমদের মধ্য হতেও অনেকে উক্ত দু'টি বিষয়কে বিচ্যুত করতে চায়, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত '*তামকীন*' বা শক্তি অর্জন করতে হলে এ দু'টি বিষয় কারণভাবে উপেক্ষা করার নয়, আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে এখন পরীক্ষা করছেন। আমাদের এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে যেখানে আমাদের ঈমান অথবা কুফরীর মাঝে একটিকে বেছে নিতে হচ্ছে। এ সিদ্ধান্ত মূলত সেই পরীক্ষার একটি অংশ যা সমাজের উচ্চস্তর হতে নিম্নস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথমে রাজা-বাদশাহ্, প্রেসিডেন্ট ও আলেম উলামা হতে শুরু করে সাধারণ জনগণ সকলের উপরই পরীক্ষা চলছে। রাজা-বাদশাহ্ ও প্রেসিডেন্টদের পরীক্ষা প্রায় শেষ, ওরা কুফরীকেই বাছাই করে নিয়েছে; আল্লাহ্ই ভাল জানেন, আমার মনে হয় তাদের পরীক্ষার ফলাফল বা সম্ভব্য পরিণতি সর্বজনবিদিত। এখন আলেমগণের কঠিন পরীক্ষা চলছে– 'হয় তোমরা আমাদের পক্ষে, না হয় আমাদের বিপক্ষে'– এমন মন্তব্য দ্বারা বুশ তাদের মহা ফিৎনায় ফেলেছে। এবং সে বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহ্ ও প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করছে যারা পুলিশ অফিসার সদৃশ ওর প্রতিনিধিত্ব করছে। বুশের স্বার্থে ও সেবায় ওরা সূচারু রূপে দায়িত্ব পালন করে যায়।

'হয় তুমি আমাদের পক্ষে, না হয় বিপক্ষে'; এখন যে কোন একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে– একই সাথে দু'পক্ষে সহাবস্থান করা সম্ভব নয়। আজ থেকে দশ বছর পূর্বে কেউ চাইলে জিহাদের উপর খুৎবা দেয়ার পর বাদশাহর ভোজ সভায় শরীক হতে পারত; কিন্তু এখন দ্বৈত ভূমিকা পালন করা অসম্ভব। কার কোন পক্ষে অবস্থান তা পরিষ্কার হতে হবে। মাঝের ভেদ রেখা সুস্পষ্ট হয়ে দু'পক্ষ ক্রমশ পরস্পর হতে পৃথক হয়ে যাবে। এ

"Millat Ibrahim" গুরুত্বপূর্ণ বইটি পড়ে দেখার জন্য পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল। মূল বইটি আরবী ভাষায় হলেও ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই এর অনুবাদ রয়েছে।

কারণে রাসূল **عليه وسلم ا صلى** বলেন, এই পরীক্ষা ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে, যতক্ষণ না মানুষ দুই শিবিরে সম্পূর্ণ বিভক্ত হয়ে পড়বে। একটি শিবির হবে পূর্ণাঙ্গ মু'মিনদের যেখানে কোন মুনাফিক থাকবে না আর অপর শিবিরটি কুফরীপূর্ণ, ঈমান নিশ্চিহ্ন।

বর্তমানে ঈমান-কুফর একত্রে মিশে রয়েছে; যতক্ষণ না এই মিশ্রণ বিদূরিত হয়ে স্বাতন্ত্র্য আসবে, ততক্ষণ উম্মতের বিজয় অর্জন হবে না। সাইয়্যিদ কুতুব **ا ه ر** তার তাফসীর ফী যিলালিল কুর'আনে বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ দুনিয়ার বুকে কাউকে প্রতিষ্ঠা দান করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে জেনে নেন যে, কে তাঁর পক্ষে আর কে তাঁর বিপক্ষে।"

এটা সম্ভব হবে না যতক্ষণ না উম্মাহ্ মিশ্রিত অবস্থায় থাকবে। এখন এই উম্মাহ্ প্রয়োজন, মু'মিন এবং মুনাফিক - এ দু'টি শিবিরকে বিভক্ত করে দেয়া।[১২] আল্লাহ্ তা'আলা বুশের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে পরীক্ষা করছেন। বুশ এবং মুজাহিদরা ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে সাধারণ মানুষকে পরীক্ষায় ফেলছে এবং তাদের মতাদর্শ গ্রহণে জনগণকে আকৃষ্ট করছে। আর এ কারণেই আমেরিকানরা একে বলে থাকে– "The battle of mind & heart" (স্নায়ু যুদ্ধ)। তবে বাস্তবিক এটা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে লড়াই।

ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبونَ

"আর যারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহ্র দল এবং তারাই বিজয়ী।" *[সূরা মায়িদাহ্ঃ ৫৬]*

---

[১২] সুবহানাল্লাহ্! ধর্মত্যাগী ও প্রকাশ্য মুনাফিক হওয়া সত্ত্বেও এখনও বহু অজ্ঞ মুসলিম পাওয়া যায়, যারা বলে যে তাদের সাথে আমাদের সহনশীল হওয়া উচিত। এমনও কিছু আছে যারা বলে, বিধর্মীদের মধ্যে যারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় আছে তাদের সাথেও আমাদের সহনশীল হওয়া উচিত। আমাদের প্রশ্ন, এই সহনশীলতার পরিধি কতদূর। তাদের এমন মন্তব্য শুনে মনে হয় যে, আল্লাহ্র শত্রুদের ঘৃণা ও তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা যে আমাদের ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তার কোন অস্তিত্ব বুঝি আর নেই।

সুতরাং আল্লাহ্র অনুসারীগণ ততক্ষণ বিজয়ী হতে পারবে না যতক্ষণ না *আল-ওয়ালা*-র ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়– মু'মিনদের প্রতি *ওয়ালা*।

সংক্ষেপে পিছনের আলোচনায় ফিরে তাকাই, আল্লাহ্ তা'আলা কোন পরিণতি চাইলে তিনি তার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র তৈরী করবেন। আমরা এই মূলনীতি প্রমাণের জন্য তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করেছিঃ *বু'য়াস*, পারস্য জয় এবং সালাহ্ উদ্দিন আইয়্যুবীর **।a ,** দৃষ্টান্ত।

আমরা আরও আলোচনায় এনেছিঃ

১) ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে

২) আল্লাহ্ কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চল (ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য) প্রস্তুত করছেন।

৩) পাশ্চাত্যে মৌলবাদের উত্থান।

৪) উম্মতকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে দু'টি ঘাঁটি[১৩] অতিক্রম করতে হবে।

[১৩] *আল-ওয়ালা ওয়াল বারা'* ও *জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্*।

(৬) এই উম্মতের সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান

আমরা সবাই আমাদের সমস্যার কথা স্বীকার করি। সকলেই বলে থাকি যে, উম্মাহ্ সমস্যায় জর্জরিত কিন্তু সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। আমাদের সামনে কুর'আন ও সুন্নাহ্ থাকায় ভিন্নমত পোষণ করা আদৌ সমীচীন নয়। কুর'আন এবং সুন্নাহ-তে সমাধান পাওয়া গেলে ভিন্নমতের কোন অবকাশ নেই। তাহলে আমাদের সমস্যার সমাধান কি? এর সমাধান নিম্নোক্ত হাদীস থেকে পাওয়া যাবে। রাসূল **صلى ا عليه وسلم** বলেনঃ

"যখন তোমরা ব্যাবসা-বাণিজ্যে ডুবে যাবে, গরুর লেজের পিছনে পড়ে থাকবে, কৃষিকার্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে আর আল্লাহ্র পথে জিহাদ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর দুর্দশা আপতিত করবেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তা তুলে নেয়া হবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রকৃত দ্বীন (অর্থাৎ ইসলামে) ফিরে আসবে।"[১৪]

এই হাদীস হতে আমাদের সমস্যা ও সম্ভব্য সমাধান জানা যাচ্ছে। মজার ব্যাপার হল, হাদীসে যে সব সমস্যার কথা বলা হয়েছে, কতিপয় মুসলিম তাই সমাধানের উপায় বলে দাবি করছেন। তাহলে সমস্যা কোথায়? রাসূল **صلى ا عليه وسلم** স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, যখন তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকর্ম, পশু-সম্পদের পিছনে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ ত্যাগ করবে, তখন তোমরা নিগৃহীত হবে।

কতিপয় মুসলিম দাবী করে যে, যদি আমরা অন্যান্য জাতির ন্যায় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক সমৃদ্ধি অর্জন করে ওদের সমকক্ষতা লাভ করতে পারি কেবল তখন উম্মতের বিজয় অর্জন হবে। সুতরাং আমরা যদি কৃষিতে সফল হই, শিল্প,

---

[১৪] আব্দুল্লাহ্ ইবন উমার **رضي ا عنهما** হতে বর্ণিত। সুনান আবু দাঊদ, অধ্যায়- ২৩, হাদীস নং ৩৪৫৫; সহীহ আল-জামী', হাদীস নং- ৬৮৮; আহমদ, হাদীস নং ৪৮২৫ এবং আবু উমাইয়া আত-তারুসী হতে মুসনাদ ইবনে উমার, হাদীস নং- ২২।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রযুক্তিসহ সকল ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করি এবং তাই উম্মতের সামনে সমাধানের খোলা পথ। কিন্তু রাসূল **صلى ا عليه وسلم** সেগুলোকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

কতিপয় মুসলিম বলে থাকে যে, উম্মতকে সন্ত্রাসের পথ পরিহার করে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, প্রযুক্তিসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত। কেবল এভাবেই পৃথিবীর অন্য সকল দেশের সাথে পাল্লা দিয়ে সমান তালে চলা সম্ভব। রাসূল **صلى ا عليه وسلم** বলেন সেরকম করা ভুল আর আমরা ভুল করলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অপমান করবেন। রাসূল **صلى ا عليه وسلم** একথাও বলেছেন যে, এ সংকট উত্তরণের একমাত্র পথ - প্রকৃত দ্বীনে ফিরে যাওয়া। এ হাদীসের ভাষ্যকারগণ বলেন, 'দ্বীনে ফিরে যাওয়া' অর্থ হল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র প্রত্যাবর্তন করা, কেননা রাসূল **صلى ا عليه وسلم** জিহাদ ছেড়ে দেয়াকে দ্বীন পরিত্যাগের কারণ বলেছেন, তাহলে জিহাদ ও দ্বীন পরস্পর সমার্থক। সুতরাং উম্মাহ্‌র জন্য সমস্যার বাস্তব সম্মত একমাত্র সমাধান হল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্-তে ফিরে যাওয়া।

ইবন রজব আল-হাম্বল **ر ه ا** একজন সালাফের কথা উল্লেখ করেন যাকে বলা হয়েছিল, "আপনি কেন নিজের ও আপনার পরিবারের জন্য একটি খামারের ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন না?" তিনি জবাবে বলেছিলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন কৃষকদের হত্যা করে তাদের খামার নিয়ে নিতে।"

যখন উমার ইবন আল-খাত্তাব **رضي ا عنه** শুনলেন যে, সাহাবীগণ জর্ডানে গণীমত হতে প্রাপ্ত উর্বর জমি কর্ষণে ব্যস্ত, শস্য ঘরে তোলার ভরা মৌসুম পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন, তারপর সমস্ত ক্ষেত-খামার আগুনে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কতিপয়

সাহাবা অভিযোগ করতে আসলে তিনি বললেন, "এ ধরনের কাজ আহলে কিতাবগণ করে, তোমাদের কাজ হল আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা এবং তাঁর দ্বীনকে প্রচার করা।"[১৫]

ক্ষেত-খামার ও কৃষিকার্য আহলে কিতাবগণের উপর ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাও; ওরা কৃষিকার্য করে তোমাদের খাওয়াবে; তারা তোমাদের *জিযিয়া*[১৬] ও *খারাজ*[১৭] প্রদান করবে।

---

[১৫] *সুবহানাল্লাহ্!* এ রকম একটি ঘটনা হলঃ আবু ইমরান বলেন, আবু আইয়্যুব হতে বর্ণিতঃ "আমরা মদীনা হতে কনস্ট্যানটিনোপাল অভিযানের নিয়্যতে বের হলাম। আব্দুর রহমান বিন খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন আমাদের দলনেতা, রোমানগণ শহরের প্রাচীরে সারিবদ্ধভাবে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। জনৈক মুসলিম সহসা শত্রুদের উপর হামলা চালাল। তখন অন্যান্য মুসলিমগণ বলে উঠলঃ থাম! থাম! আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। সে তো নিজেকে ধ্বংসের মুখে ফেলছে। আবু আইয়্যুব আল-আনসারী رضي ا عنه বলেন,

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

'আর ব্যয় কর আল্লাহ্‌র পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।' *[সূরা আল-বাকারাহঃ ১৯৫]*

এই আয়াত আমাদের অর্থাৎ আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। যখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে صلى ا عليه وسلم সাহায্য করলেন, ইসলামকে বিজয় দান করলেন, আর আমরা বললাম এবার তাহলে আমরা জায়গা-জমিতে ফিরে যাই এবং সেগুলোর উন্নতি সাধন করি, তখন আল্লাহ্ উক্ত আয়াত নাযিল করেন।" আসলে যে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে নিজেকে বিপদে ফেলে না বরং যে বসত-বাড়ি, ধন-সম্পদের মোহে পড়ে থাকে, সেগুলো উৎকর্ষ সাধনে ব্যস্ত হয়ে জিহাদ পরিহার করে, সেই নিজেকে বিপদে ফেলে। আবু ইমরান বলেনঃ আবু আইয়্যুব আমৃত্যু জিহাদ অব্যাহত রাখেন, শাহাদাহ্ লাভের পর কনস্ট্যানটিনোপলে তাঁকে দাফন করা হয়। (সুনান আবু দাউদ, গ্রন্থ- ১৪, হাদীস নং- ২৫০৬)

[১৬] খিলাফতের বশ্যতা স্বীকার করে কাফিররা যে কর প্রদান করে।

[১৭] কাফিররা যে ভূমিকর খলিফাকে প্রদান করে।

রাসূল **صلى الله عليه وسلم** বলেন, ***"আমার রিয্ক আসে আমার বর্শার ছায়াতল হতে।"***[১৮]

তাহলে রাসূল **صلى الله عليه وسلم** এর রিযক যদি গণিমত হতে আসে তবে নিঃসন্দেহে তা সর্বশ্রেষ্ঠ রিয্ক এবং ক্ষেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, পশু-পালন– যেকোন প্রকার উপার্জনের চেয়ে তা উত্তম।

ইরাকের ইসলামী আর্মি "*আল-জাইশ আল-ইসলামী ফিল ইরাক*" এর মুখপাত্রকে এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়, "আপনাদের অর্থনীতির উৎস কী?" জবাবে তিনি বলেন, "আমাদের অর্থনৈতিক উৎস গণীমতের মাল, তবে মুসলিমরা আমাদের কিছু অনুদান করতে চাইলে আমরা আপত্তি করি না।" তারা কারো মুখাপেক্ষী হতে চায় না। গণীমত দ্বারা তারা তাদের আল্লাহ্র পথে জিহাদে অর্থের যোগান দিতে চায়। তাহলে উম্মতের জন্য সমস্যার সুরাহা হচ্ছে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্। উম্মাহ্ যখন এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে পুনর্জাগ্রত করে তখন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ অনেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ জিহাদ হতে দৌড়ে পালায়, কারণ এতে তাদের জীবন ও ধন-সম্পদ খোয়ানর আশঙ্কা থাকে। কিন্তু মজার বিষয় হল, উম্মাহ্ যখন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র উপর থাকে উম্মতের তখন সবচেয়ে সচ্ছল অবস্থা বিরাজ করে এবং সবচেয়ে কমসংখ্যক লোক নিহত হয়।

মৃত্যুহারের একটি গ্রাফ চিত্র অঙ্কন করলে দেখা যাবে, সবচেয়ে কম সংখ্যক মুসলিম মারা গিয়েছিল যখন তারা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র উপর ছিল। আর উম্মাহ্ যখন তা ত্যাগ করে তখন মৃত্যুহার লক্ষাধিকে পৌঁছায়। অর্থনৈতিক অবস্থার গ্রাফচিত্র অঙ্কন করলে দেখা যাবে, উম্মাহ্ সবচেয়ে সচ্ছল ছিল, যখন তারা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র উপর ছিল আর তা ত্যাগ করার পর অর্থনৈতিক ভাবে তারা সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্থ হয়।

---

[১৮] আহমাদ, আত-তাবারানী, সহীহ হিসেবে গণ্য, সহীহ আল-জামী' আস-সাগীর, হাদীস নং-২৮২৮।

মানবতার ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যতিক্রমধর্মী। কেবল ইসলামী রাষ্ট্র তার জনগণের উপর কর আরোপ করে না। কিন্তু কেন? কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস হচ্ছে জিযিয়া, খারাজ, গণীমতের মাল এবং *ফাঈ*[১৯], সে কারণে ইসলামী রাষ্ট্রকে জনগণের উপর কোন কর আরোপ করতে হয় না। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ্ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ ত্যাগ করায় মুসলিম জনগণের উপর কর আরোপিত হচ্ছে। রাসূল **صلى عليه وسلم** । বলেন, ***"কর হারাম এবং যে ব্যক্তি করের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কাজে বা পেশায় নিয়োজিত হবে সে অভিশপ্ত।"***

অতএব, সমাধান আসলে দুর্বোধ্য জটিল গূঢ় তত্ত্ব বা অসম্ভব কিছু নয় বরং সহজ সরল। মানুষের উচিত আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে ওঠা এবং এই একটি হাদীসের অর্থ অনুধাবন করে তদানুযায়ী আমল করা।

سبحـانَكَ اللّهـم وبحمدك،

أَشْهـد أن لا إله إلاّ أنْتَ أستَغْفرك وأتوب إلـيك

---

[১৯] যুদ্ধ ছাড়া কাফিরদের কাছ থেকে যা অর্জিত হয়- যেমন মুসলিমদের ভয়ে কাফিররা তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রেখে পালাল, কিংবা তারা যুদ্ধ ব্যতীত আত্মসমর্পণ করল অথবা তারা জিযিয়া প্রদান করল, ইত্যাদি। *ফাঈ*-এর বন্টন ইমামের নির্দেশানুযায়ী হবে।